নিবেদন

"ঠাকুর হরিদাস" কতিপয় ধারাবাহিক প্রবন্ধে সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র "নারায়ণে" প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এই গ্রন্থ গ্রথিত হইল। নভেল-প্লাবিত নব্য বঙ্গে ঠাকুর হরিদাসের কিরূপ আদর হইবে তাহা ঠাকুর জানেন। ইতি—

বৈশাখ ১৩২৭
কলিকাতা

শ্রীরেবতীমোহন সেন

ঠাকুর হরিদাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশের অবস্থা

হরিদাস ঠাকুর যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে মুসলমানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই আড়াই শত বৎসরে বাঙ্গালার বহু হিন্দুসন্তান নবাবী-শাসনের তীব্রতা সহিতে না পারিয়া, মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাঁহারা হিন্দু থাকিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই আচার-ব্যবহার, ভাষা ও আদব-কায়দা অনেকটা মুসলমানী ছাঁচের হইয়া পড়িল। খাঁটি হিন্দুকে সতত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। কারণ কাজীর বিচারে কখন কাহার শ্রাদ্ধ কোথায় গিয়া যে গড়াইত, তাহার স্থিরতা ছিল না। কখন কখন 'উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে' যাইয়া পড়িত। তবে সে কালে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জন্য কেহ ভাবিত না। প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি দেশে সঞ্চিত থাকিত। সাধারণ লোকেরা ধর্ম্মভীরু ছিল, কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মার্থ প্রায় কেহ বুঝিত না। যাঁহারা খুব বাহ্য আড়ম্বর করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে

রিতেন, তাঁহারাই যশস্বী হইতেন। আত্মীয়-স্বজনের পীড়া
ইলে সত্যনারায়ণের সিন্নী ও মঙ্গলচণ্ডীর পূজা দেওয়া, সর্পভয়ে
বিষহরীর গান শুনা এবং আয়ুর্বৃদ্ধি ও সন্তানলাভাদির কামনায়
বেতাবিশেষকে মানস করা প্রভৃতি সাধারণতঃ ধর্ম্ম-কর্ম্মের অঙ্গ
ল। কেহ কেহ দোলদুর্গোৎসবও করিতেন।

পণ্ডিতগণ খুব শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা অনবরত
স্ত্রের লড়াই করিয়া কাল কাটাইয়া দিতেন। অনেকে অদ্বৈত-
দী ছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান যে জীবনে লাভ করিতে হয়, সে দিকে
ায় কাহারও দৃষ্টি ছিল না। সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম, আত্মা,
াাত্মা ও মায়া লইয়া ঘাটে পথে বাদবিতণ্ডা করিয়াই তাঁহারা
নের গৌরবে দৃপ্ত থাকিতেন। প্রকৃত ভগবদুপাসনা,
বদ্ভক্তি এখানে সেখানে অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে
াদ্ধ ছিল। এই সময়ে দেশমধ্যে বামাচারী শাক্ত সাধকদিগের
াবও নিতান্ত অল্প ছিল না। তাঁহাদের কপালে রক্তচন্দনের
টাঁ, গলে রুদ্রাক্ষমালা ও হস্তে সুরাপূর্ণ নর-কপাল শোভা
ত। সাধারণ লোকেরা তাঁহাদিগকে সিদ্ধপুরুষ জ্ঞান করিত
ঃ তাঁহাদের ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ থাকিত।

> "ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে,
> মঙ্গলচণ্ডীর গীত রাত্র-জাগরণে।
> বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে,
> মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।"
>
> (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত)

এই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতরে আমাদের হরিদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জন্ম ও গৃহত্যাগ।

কলিপাবন প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ হরিদাস ঠাকুরের পবিত্র চরিত্রমাধুর্য্য ও ভক্তি-মাহাত্ম্য আপন শ্রীমুখে কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "হরিদাস! আমি কেবল আপনাকে পবিত্র করিবার নিমিত্তই তোমাকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিলাম। ইহাতে তুমি কেন সঙ্কোচ করিতেছ? ফলতঃ তুমি ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী হইতেও পবিত্র।"

> "প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে,
> তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে।
> ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান,
> ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান।
> নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন,
> দ্বিজ ন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন।"
>
> (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ব্রাহ্মণকুমার শ্রীল বৃন্দাবনদাস হরিদাস ঠাকুরের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া অসঙ্কোচে প্রাণের আবেগে বলিয়া গিয়াছেন—

> "হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ,
> গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন।

স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস,
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মপাশ।"

(শ্রীচৈতন্য-ভাগবত)

এ হেন হরিদাস ঠাকুরের জন্ম হইয়াছিল—যবনকুলে। এ নিমিত্ত তিনি সাধারণতঃ "যবন হরিদাস" নামে খ্যাত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে, স্বয়ং চতুরানন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের ধেনু-বৎস অপহরণের অপরাধে নীচ যবনকুলে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। গূঢ় কারণ, শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় যোগদান করা। এই কারণে তিনি 'ব্রহ্ম-হরিদাস' নামেও অভিহিত হইতেন। কেহ বলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়া নিতান্ত শৈশবেই মাতৃহীন ও পিতৃহীন হওয়াতে যবন-গৃহে লালিত-পালিত ও যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে সেরূপ ইতিহাস কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস হরিদাস ঠাকুরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালের লেখক। তিনি স্বীয় গ্রন্থে স্পষ্ট কথায় লিখিয়াছেন—

"জাতি কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে,
জন্মিলেন হরিদাস প্রভুর আজ্ঞাতে।
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়,
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
উত্তম কুলেতে যদি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে,
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে।

এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে,
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে।"

(শ্রীচৈতন্য-ভাগবত)

ভক্তিনিধি শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হরিদাস হিন্দুসন্তান, তাঁহার মাতার নাম গৌরী-দেবী এবং পিতার নাম সুমতি শর্ম্মা, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোনও প্রমাণ দেখান নাই। আবার জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গলে দেখিতে পাই যে, হরিদাস ঠাকুরের মাতার নাম উজ্জ্বলা, পিতার নাম মনোহর। এরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ কথার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করা যায় না।

যাহা হউক, জন্মতঃই হউন, কি অন্য প্রকারেই হউন, তিনি যবন ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। ক্রমে তাহা প্রকাশ পাইবে।

১৩৭২ শকে (১৪৫০ খৃঃ) যশোহর জিলার অন্তর্গত বনগ্রাম বিভাগস্থ ব্যূঢ়ণ নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে হরিদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন।

"ত্রয়োদশ শত দ্বিসপ্ততি শকমিতে,
প্রকট হইলা ব্রহ্মা ব্যূঢ়ণ গ্রামেতে।

(শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ)

হরিদাস আজন্ম বৈরাগী। তিনি বাল্যকালেই গৃহত্যাগ করেন এবং নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বেণাপোলের

জঙ্গলে আসিয়া আসন স্থাপনপূর্ব্বক একান্ত ভজনে রত হয়েন। এই বেণাপোলও বনগ্রাম-বিভাগেরই একটি গ্রাম। এই সময়ে তিনি পূর্ণবয়স্ক যুবক। এতদিন হরিদাস কোথায় ছিলেন বা কি করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই, তবে এই বেণাপোলে যখন তিনি প্রথম আসিলেন, তখন লোকেরা দেখিল যে, তাঁহার রসনায় অবিরাম হরিনাম উচ্চারিত হইতেছে, নয়নে প্রেমাশ্রুধারা, সর্ব্বাঙ্গে পুলক; ঠাকুর দিবানিশি হরিনাম-রসে বিভোর। এমন হরিভক্তি, এমন দেবদুর্ল্লভ অবস্থা তিনি কেমন করিয়া লাভ করিলেন, তাহা সম্যক্ জানা যায় না। এ জিনিষ তখন বঙ্গদেশে নিতান্ত সুলভ ছিল না।

হরিদাস ঠাকুরের সময়ে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকেই তীর্থদর্শন উপলক্ষে বঙ্গদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন। তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া সময় সময় সুপাত্র দেখিয়া কাহাকেও কাহাকেও হরিনাম প্রদান করিতেন, এমত প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপে স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, ও চৈতন্যবল্লভ দত্ত প্রভৃতি অনেকে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী মহাশয় মধ্বাচার্য্যের পঞ্চদশ পুরুষ অধস্তন প্রধান শিষ্য। তিনি কৃষ্ণভক্তি-প্রদানে অসাধারণ শক্তিশালী সমর্থ গুরু। তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম অদ্ভুত। আকাশে মেঘ দেখিলেই তাঁহার হৃদয়ে সেই নবজলধর-শ্যাম শ্যামসুন্দরের ভুবনমোহন শ্যাম-কান্তি স্ফূর্ত্তি পাইত, অমনি তিনি সমাধিস্থ হইয়া কৃষ্ণরূপে

ডুবিয়া যাইতেন। কৃষ্ণভক্তি দিতে তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী গুরু আর কে? হরিদাস ঠাকুরের জীবনে যে প্রকার প্রেমভক্তির বিকাশ হইয়াছিল, তাহার ভিতরে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের প্রেমের গন্ধ পাওয়া যায় ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুমিত হয়। অনেক বৈষ্ণব মহাজনের বিশ্বাস যে, হরিদাস উদাসীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন শুভ মুহূর্ত্তে স্বয়ং মাধবেন্দ্র পুরীরই কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

হরিদাস উদাসীন ভক্ত, হরিনামজপে একান্ত অনুরক্ত। প্রতিনিয়ত হরিনাম করাই তাঁহার ব্রত, একটি শ্বাসও বৃথা ব্যয় করিতে তাঁহার প্রাণে ক্লেশ হয়। এই কারণে তিনি জন-কোলাহল হইতে একটু দূরে থাকিবার আশায় বেণাপোলের নির্জ্জন বনপ্রদেশই তাঁহার ভজনের অনুকূল স্থান বলিয়া বাছিয়া লইলেন এবং তথায় থাকিয়া বৃক্ষমূলে বসিয়া দিবানিশি স্বীয় প্রিয় হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

সরোবরে সুরভি কমল প্রস্ফুটিত হইয়া আপন মনে আপনি হাসিতে থাকে, সে কাহাকেও ডাকে না, কাহাকেও খোঁজে না। কিন্তু তথাপি তাহার হৃদয়ে যে মধু-সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া, দূরদূরান্তর হইতে মধুকর আসিয়া তাহাতে সঙ্গত হয়। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিত যাঁহাদের হৃদয়, তাঁহাদের হৃদয়-নিহিত ভক্তির প্রভাব, যেন মধু-সৌরভের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া, চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তি-পিপাসু জনগণকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া আনে। সেই নির্জ্জন

অরণ্যেও হরিদাস নির্জ্জনে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত মধুমাখা হরিনাম শুনিবার নিমিত্ত সে স্থানে ক্রমে লোকসমাগম হইতে লাগিল এবং এইরূপে যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারা তাঁহার দিব্য তেজঃপুঞ্জ গৌরকান্তি ও ভক্তি-বিগলিত নিষ্কিঞ্চনভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা হরিদাস ঠাকুরের ভজনের নিমিত্ত সেই অরণ্যে একটি পর্ণ-কুটীর বাঁধিয়া দিলেন।

হরিদাস ঠাকুর সেই তৃণ-কুটীরে থাকিয়া অহোরাত্র নাম-জপে কাল কাটাইতে লাগিলেন। প্রতিদিন অন্ততঃ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। তাঁহার নিয়ম ছিল, প্রতিমাসে এক কোটী নাম জপ করা। তিনি তাঁহার কুটীরের নিকট একটি তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া তাহার মূলে জল সেচন ও সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া নাম-জপে বসিতেন। হরিদাস নামরসে বিভোর হইয়া অনুক্ষণ নামানন্দে মগ্ন থাকিতেন, দেহ-গেহ ভুলিয়া যাইতেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জ্ঞানও তাঁহার থাকিত না। প্রাতঃকালে তুলসী সেবা করিয়া একবার নাম-জপে বসিলেই কোথা দিয়া যে সময় চলিয়া যাইত, তাহা তিনি বুঝিতেন না। এক বৈঠকেই একবারে বেলা শেষ! সুতরাং তিনি নিজের জন্য রাঁধিবেন কখন? আবারও ত নামজপে বসিতে হইবে, দিবারাত্রে তিনলক্ষ নাম পূর্ণ হওয়া চাই ত? পক্ষান্তরে শরীরকে কিছু আহার না যোগাইলেও সে বিগড়াইয়া যায়, সে বিগড়াইলে ভজন হয় না। তাই তিনি

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই দ্রুতপদে নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইয়া এক এক দিন এক এক ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া আসিতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় তুলসী-প্রণাম, আর দিন-রাত জাগিয়া নামকীর্ত্তন, ইহাই ছিল হরিদাস ঠাকুরের ভজন।

"নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন,
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন,
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ,
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন।"

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

সকলে নাম জপ করে মনে মনে, আর হরিদাসঠাকুর নাম করিতেন উচ্চৈঃস্বরে। তাঁহার স্বাভাবিক সুমধুর কণ্ঠ ভাবে ভারি হইয়া যখন জগন্মঙ্গল হরিনাম উচ্চারণ করিতে থাকিত, তখন বুঝি বা বনের পশু-পক্ষীও তাহা শুনিয়া মোহিত হইত। গ্রামের লোকেরা সেই আকর্ষণে আসিয়া ঠাকুরের কুটীরের ক্ষুদ্র আঙ্গিনায় জড় হইত। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই আসিত। তাহারা তৃষিত নেত্রে সেই দেবোপম মূর্ত্তি দর্শন করিত আর মুগ্ধচিত্তে সেই প্রাণগলান মনভুলান হরিনাম বসিয়া বসিয়া শুনিত। কেহ কেহ বা হরিদাসঠাকুরের সেবার জন্য বিবিধ ফলমূল আনিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার আসনের সম্মুখে রাখিয়া দিত। ঠাকুর হরিদাস হরিধ্বনি করিতে করিতে তৎসমুদয় বালক বৃদ্ধ, সকলকে বিলাইয়া দিতেন। ইহাতে বালকদিগের আনন্দের সীমা থাকিত না। তাহারা ফলমূল পাইয়া মনের

আনন্দে হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিত। বৃদ্ধেরাও হরিদাস ঠাকুরের হাতের হরির লুট পাইয়া ভক্তিভরে তাহা মস্তকে ধারণ করিতেন এবং নিজে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট গৃহে লইয়া যাইতেন। এইরূপে সে স্থানে প্রতিদিন আনন্দ-বাজার বসিত। বোধ হয় এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই পদকর্ত্তা দৈবকীনন্দন দাস তাঁহার রচিত বৈষ্ণব-বন্দনায় লিখিয়াছেন—

"হরিদাস ঠাকুর বন্দ বীরত্ব প্রধান,
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম।"

এইরূপে দেশের মধ্যে হরিদাস ঠাকুরের একটা নাম পড়িয়া গেল। ক্রমে দূরবর্ত্তী স্থানসকল হইতেও ভদ্রাভদ্র নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া ঠাকুরকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। সকলেরই মুখে হরিদাসের প্রশংসা। উহা কেবল মুখের প্রশংসা নহে, খোলাপ্রাণে মুখভরা প্রশংসা। কারণ, মানুষ যে এমন দেবতা হইতে পারে, এ কথা তাহারা কখনও শুনেও নাই এবং এমনটি আর দেখেও নাই। তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ও প্রেমে ঢল ঢল প্রসন্নবদন চক্ষে পড়িবামাত্র আপনা হইতেই লোকের প্রাণ যাইয়া তাঁহার চরণে নুইয়া পড়িত। এক অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি হরিদাস ঠাকুরের অঙ্গে সতত বিরাজ করিত। তাঁহাকে দেখিয়া যে শত শত লোকে ভক্তি করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি ? সর্ব্বোপরি তাঁহার কমল-নয়নের স্নেহ-দৃষ্টি ও কণ্ঠনিঃসৃত মধুমাখা হরিনাম সংকীর্ত্তন চিত্ত-বিত্ত

হরণ করিয়া লইত। হরিদাসঠাকুর সর্ব্বদাই হরিনাম-রসে ভরপূর হইয়া থাকিতেন, এ নিমিত্ত সহস্র কণ্ঠের প্রশংসা-স্তুতিবাদ তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারিত না। তিনি ঠাকুরালি জানিতেন না, করিতেনও না। কিন্তু ঠাকুরের ন্যায় পূজা পাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেণাপোলে—ভক্তের বীরত্ব

বনগ্রাম প্রদেশের তদানীন্তন ভূম্যধিকারী ছিলেন রাজা রামচন্দ্র খান। নবাবী আমলে বঙ্গীয় হিন্দুগণ ঠাকুরতা, দস্তিদার, মজুমদার, খাসনবিশ, মহলানবিশ প্রভৃতি মুসলমানী উপাধি লাভ করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত জ্ঞান করিতেন। ধনে মানে যাঁহারা একটু বড়, এইরূপ জমিদারগণ খান প্রভৃতি উপাধি পাইতেন। কিন্তু আপন আপন জমিদারীমধ্যে তাঁহারা রাজা বলিয়াই পরিচিত হইতেন। রামচন্দ্র খান শক্তির উপাসক ও জাতিতে ব্রাহ্মণ। দুর্দ্দান্ত জমিদার বলিলে যাহা বুঝায়, তিনি তাহাই ছিলেন।

হরিদাস ঠাকুরের প্রভাবের কথা এত দিনে বনগ্রামের ছোট বড় সকলেই অবগত হইয়াছে। যাঁহাদের একটু স্বাভাবিক ধর্ম্ম-মতি আছে, তাঁহারা দলে দলে যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া

আসিতেছেন, আসিয়া শত মুখে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। আর যাঁহাদের মতি-গতি অন্যপ্রকার, তাঁহারা হরিদাস ঠাকুরের কথা লইয়া পথে ঘাটে তর্কবিতর্ক ও সমালোচনার ঝড় বহাইয়া দিতেছেন। হরিদাস ঠাকুরের অপরাধ যে, তিনি জাতিতে যবন হইয়া কেন হিন্দুর হরিনাম করেন, আর হিন্দুরা যাইয়া কেন তাঁহাকে ভক্তি করে? জমিদার রামচন্দ্র সমস্ত শুনিয়া চিত্তে স্থির থাকিতে পারিলেন না। যবন হইয়া হিন্দুর হরিনাম গ্রহণ? আর হিন্দুর উপর ঠাকুরালি? প্রবল পরাক্রান্ত রামচন্দ্র কি ইহা সহিতে পারেন? না, কখনই নহে। যে প্রকারেই হউক, যবনকে জব্দ করিতেই হইবে, ইহাই খানের প্রতিজ্ঞা।

যেমন রাজা, তেমন তাঁর মন্ত্রী, আর তেমন তাঁর মন্ত্রণা-সভা। মন্ত্রণায় পারিষদগণ রামচন্দ্রের প্রতি কথায়ই সায় দিলেন এবং অতি উত্তম বলিয়া প্রশংসা করিলেন। মন্ত্রণার চূড়ান্ত হইয়া গেল। রামচন্দ্র খান তাঁহার এলাকার কয়েকটী বেশ্যাকে ডাকাইয়া আনিয়া আদেশ করিলেন—"তোমাদের মধ্যে যে কেহ যাইয়া হরিদাসের ধর্ম্মনষ্ট করিয়া আসিতে পারিবে, সে বহু অর্থ ও বিত্ত পুরস্কার পাইবে। অদ্যই ইহা করিতে হইবে।"

"কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়,
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়।
বেশ্যাগণে কহে—এই বৈরাগী হরিদাস,
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নাশ।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

বেশ্যারাও ইতিপূর্ব্বেই হরিদাস ঠাকুরের মহিমার কথা শুনিয়াছিল। বেশ্যা হইলে কি হয়? বেশ্যাদের মধ্যেও এমন আছে, যাহারা ঠাকুর-দেবতা মানে এবং প্রকৃত সাধুর বিরাগ উৎপাদন করিতে ভয় পায়। তাই জমিদারের এই রূপ আজ্ঞা শুনিয়াও তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নীরব হইয়া রহিল। কিন্তু রূপ-যৌবনের বিশেষ গর্ব্ব রাখে, এমন এক হতভাগিনী উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং গর্ব্ব করিয়া বলিল— "মহারাজ! যদি আজ্ঞা হয়, তবে আমি যাইয়া তিন দিনের মধ্যেই তাহাকে মোহিত করিয়া আসিব, এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি।"

"বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী,
সেই কহে তিন দিনে হরিব তার মতি।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

---

* এই বেশ্যাটী সম্বন্ধে "যশোহর খুলনার ইতিহাস" লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেন—"তিনি (রামচন্দ্র খান) বেশ্যাসক্ত হীনচরিত্র ছিলেন। তাঁহার একটী বেশ্যার নাম হীরা। দুর্বৃত্ত জমিদারের বিপুল অর্থ আকর্ষণ করিয়া হীরা লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছিল; তাই লোকে বলে, তার জন্য তাহার নাম হইয়াছিল 'লক্ষহীরা। হরিদাসের সর্ব্বনাশ সাধন জন্য রামচন্দ্র এই লক্ষহীরাকে নিযুক্ত করেন। * * * কাগজ পুকুরীয়া'র সন্নিকটে গয়ড়া-রাজাপুরে হীরার জন্য একটী বাটী প্রস্তুত হইয়াছিল। রামচন্দ্র ময়ূরপঙ্খী তরণীতে চড়িয়া যে পথে হীরার বাড়ী যাতায়াত করিতেন, সে পথে খালের চিহ্ন এখনও আছে। রাজাপুর এক্ষণে লোকশূন্য প্রান্তর হইয়া গিয়াছে। সেখানে হীরার ভিটার ইষ্টকাদি ভগ্নাবশেষ এবং "হীরার পুকুরের" খাত এখনও সেই প্রাচীনকালের সাক্ষ্য দিতেছে। কাগজপুকুরিয়াও গয়ড়া-রাজাপুর বেণাপোল হইতে দেড় মাইল কি দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থিত।"

তিন দিনের কথাটা রামচন্দ্রের ভাল লাগিল না। তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি ঐ মুহূর্ত্তেই হরিদাসকে একটা দুশ্চরিত্র ভণ্ড প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে উত্তমরূপ শিক্ষা দেন। তাই—

"খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে,
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

কিন্তু উক্ত রমণী প্রথমেই একবারে পাইক বরকন্দাজ লইয়া যাওয়াটা পছন্দ করিল না।

"বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হোক একবার,
দ্বিতীয় বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার।"

সেই দিনই অর্থলুব্ধা বারবিলাসিনী অপূর্ব্ব বেশভূষা করিয়া রাত্রিকালে হরিদাস ঠাকুরের স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল। আগে তুলসী-তলায় নমস্কার করিল, তার পর হরিদাসঠাকুরকে নমস্কার করিয়া কুটীরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিল।

তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা,
গোসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

এই সময়ে হরিদাসঠাকুরের বয়স অনধিক ত্রিশ বৎসর। সবল, সুবলিত, পরম শ্রীমান যুবক। কিন্তু যৌবনের চাঞ্চল্য তাঁহাতে ছিল না। সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণনাম-রসে মাতোয়ারা

হইয়া তিনি সরস যৌবন-কাল সফল করিতেছিলেন। তখন হরিদাস ঠাকুর—

"বিষয়-সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য,
কৃষ্ণ নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য।
ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরতি,
ভক্তি-রসে অনুক্ষণ হয় নানামূর্ত্তি।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

হরিদাস ঠাকুরের রূপ দেখিয়া বেশ্যা চমকিয়া উঠিল। তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে আসিয়া সে নিজেই চিত্তে মোহিত হইল। রামচন্দ্রের প্রতিশ্রুত অর্থের কথা যেন সে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গেল। এমন সুন্দর ঠাকুরের প্রণয়-লালসাই বুঝিবা এক্ষণে যুবতীর চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল। কি অপূর্ব্ব রূপ! কি মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর! হাজার বক্রবুদ্ধি হউক না কেন, বেশ্যার প্রাণে ঠাকুরের প্রতি প্রথম দর্শনেই একটা আকর্ষণ জন্মিল। ঠাকুর হরিদাস স্থিরাসনে বসিয়া অবিশ্রান্ত নাম করিতেছেন—ভক্তি-বিগলিত-কণ্ঠে মধুর মধুর হরিনাম করিতেছেন। নাম করিতে করিতে একবার রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই তিনি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল নখদর্পণের ন্যায় দেখিয়া লইলেন। আমরা মানুষের বাহির দেখিয়াই ভাল মন্দ একটা বুঝিয়া লই এবং অনেক সময়েই ভুল বুঝিয়া লই। কিন্তু তত্ত্বদর্শী সাধু-মহাপুরুষেরা জীবের অন্তঃপ্রকৃতি দেখিয়া ভাল-মন্দের বিচার করিয়া থাকেন। ঠাকুর হরিদাস দেখিলেন যে, প্রবৃত্তির

বশে অবস্থার অধীন হইয়া এই রমণীর চরিত্র বেশ্যা-চরিত্র হইলেও ইহার হৃদয়ে ইহার অন্তঃপ্রকৃতিতে ভাল জিনিস আছে। ঠাকুর মনে মনে রমণীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ঠাকুর হরিদাস পরম সুন্দর পুরুষ বটেন, কিন্তু তাঁহার আকর্ণ নয়নের স্নেহ-সিক্ত দৃষ্টি আরও সুন্দর, আরও মধুর ছিল। তাঁহার চক্ষে চক্ষু পড়িলে বুঝিবা ক্রূর সর্পও মুগ্ধ হইত। হরিদাস একবার মাত্র বেশ্যাটির পানে চাহিতেই, সেই ছলাকলা-পরায়ণা মুগ্ধা কামিনী খোলাখুলি বলিয়া ফেলিল—

"ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন,
তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে পারে মন ?
তোমার সঙ্গ লাগি লুব্ধ মোর মন,
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

হরিদাস ঠাকুর তখন কি উত্তর করিলেন ?—

"হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার,
সংখ্যা নাম সমাপ্তি যাবৎ আমার,
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন,
নাম সমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

এস্থলে "তোমায় করিব অঙ্গীকার" এবং "করিব, যে তোমার মন," এই দুইটী উক্তির বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, পরে তাহা প্রকাশ পাইবে।

সেই নারী প্রাণে আশা লইয়া দুয়ারে বসিয়া রহিল। হরিদাস ঠাকুর উচ্চ কণ্ঠে হরিনাম করিতেছেন, আর সে হত-ভাগিনী—হতভাগিনী বলিতে ইচ্ছা হয় না—বসিয়া বসিয়া তাহা শুনিতেছে এবং ঠাকুরের রূপ দেখিতেছে। কেবল ভাবিতেছে, কতক্ষণে তাঁহার নামসংখ্যা পূর্ণ হইবে। এই রূপে রাত্রি কাটিয়া গেল, প্রভাত হইল। প্রাতঃকাল দেখিয়া রমণী নিরাশ প্রাণে উঠিয়া চলিয়া গেল এবং রামচন্দ্র খানের নিকট যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

সেই বেশ্যা যাইয়া রামচন্দ্রকে আশ্বাস দিয়া বলিল যে, ঠাকুর তাহাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে বশ করিয়া ফেলিতে আর বেগ পাইতে হইবে না। ইহা ত জানা কথা। রামচন্দ্র বুঝিলেন যে, ঔষধে ধরিয়াছে। তাই বেশ্যাকে আবার অদ্য রাত্রে অধিকতর উৎসাহের সহিত পাঠাইয়া দিলেন। রমণী আজিও আসিয়া প্রথমে তুলসী নমস্কার করিল, পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কুটীরের দ্বারে বসিয়া নাম শুনিতে লাগিল। হরিনামের একটা শক্তি আছে। তাহা আবার হরিদাস ঠাকুরের ভক্তিমাখা শক্তিমাখা সুমধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছে। হরিনাম শ্রবণের একটা ফল আছেই আছে। কাল সারা রাত জাগিয়া বেশ্যাটী নাম শুনিয়াছে। আজ হরিনাম তাহার বড়ই মিষ্ট লাগিল। তাই সে বসিয়া বসিয়া যেমন নাম-কীর্ত্তন শুনিতেছে, তেমনি নিজেও মাঝে মাঝে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলিতেছে।

মুখে হরি হরি বলিলে কি হইবে ? রমণীর হৃদয়ে যে দুর্ব্বার বাসনানল জ্বলিতেছে, তাহাতে সে সোয়াস্তি পাইতেছে না। হরিনামামৃত-রস যখন কানের ভিতর দিয়া তাহার মরমে পশিবে, তখন নিশ্চয়ই এই হৃদ্‌রোগ—এই জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে নয়। আজিও দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ঠাকুরের কীর্ত্তন শেষ হইতেছে না দেখিয়া, বেশ্যা উষি-পুষি করিতে লাগিল।

"রাত্রি শেষ হৈল বেশ্যা উষি-পুষি করে।"

বেশ্যাটীর অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর হরিদাসের প্রাণ দয়ায় গলিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "দেখ, এক মাসে এক কোটী নাম জপ করা আমার ব্রত। তাহা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, অদ্য রজনীতেই এক কোটী সংখ্যা সমাপ্ত করিতে পারিব। কিন্তু তাহা হইল না, তাই তোমার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। কল্য সংক্রান্তি। কল্যই ব্রত সমাপ্ত করিতে পারিব। তুমি এজন্য মনে দুঃখ করিও না। আবার আসিও।" হরিদাস ঠাকুরের মুখে এই প্রকার স্নেহপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বেশ্যার নিরাশ প্রাণে আশার আলোক ফুটিল। রমণীহৃদয়ের কোমলতম স্থানে যাইয়া একটা কোমল আঘাত পড়িল, সে ঠাকুরকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিল।

বেশ্যাটী সর্ব্বপ্রথমে রামচন্দ্র খানের প্রতিশ্রুত অর্থের লোভেই আসিয়াছিল। মায়ামমতা বলিয়া যে একটা জিনিষ, তাহা বেশ্যাদের প্রাণে প্রায়ই থাকে না। তাহার প্রাণেও উহা

বড় একটা ছিল না। হরিদাসকে দুষ্ক্রিয়া। রাত জাগিয়া করিয়া, রামচন্দ্র তাঁহাকে শূলেই চড়ান, কি জ। ীয় মহিমা! পোড়ান, তাহাতে তাহার কি আসে যায়? তাহার ত করিতে হইল। অর্থের লালসাতেই সে একার্য্যে প্রবৃত্ত হ হইয়াছে, ইহার সঙ্গে আর একটা ব্যাপারও ছিল। উহা তাহা বনামে যৌবনের স্পর্দ্ধা। যাহার গায়ে একটু বেশী জোর আছে নে ব্যক্তি কথায় কথায় যার তার সঙ্গে লড়িতে যায়, এবং কাহাকে র বলে পরাস্ত করিতে পারিলে, মনে মনে একটা গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে। সেইরূপ যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিতা চরিত্রহীনারাও, বুঝিবা কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড জয় করিতে পারে, মনে মনে এরূপ একটা স্পর্দ্ধা রাখে।

আজ কিন্তু বেশ্যাটার মনের ভাব অন্য রূপ। সে হরিদাস ঠাকুরের রূপে—শুধু রূপে নয়, গুণেও মুগ্ধ হইয়াছে। সুতরাং রামচন্দ্র খানের হাতে ঠাকুরকে ধরাইয়া দিবার কথা কি আর সে ভাবিতে পারে? তথাপি খবরটা তাঁহাকে না জানাইলে নয়, তাই সে রামচন্দ্রের কাছে যাইয়া এই রাত্রের বৃত্তান্ত সমস্ত বলিল। কিন্তু মনে মনে বোধ হয় বলিতেছিল যে, যদি আজ ঠাকুরের কৃপা হয়, তবে সে আর গৃহে ফিরিবে না।

রমণী আজ গৃহে যাইয়া সারাদিন কেবল হরিদাস ঠাকুরের কথাই ভাবিল। আজ ঠাকুরের সমস্তই সে সুন্দর দেখিতেছে। হরিদাসের ললাটে তিলক, কণ্ঠে তুলসীর মালা ও রসনায় সুধামাখা হরিনাম, এ সমস্তই তাহার নিকট বড় সুন্দর—বড়

মুখে হরি হরি বলিলে কি হইবে? রমণীর হৃদয়ে যে দুর্ব্বার বাসনানল জ্বলিতেছে, তাহাতে সে সোয়াস্তি পাইতেছে না। হরিনামামৃত-রস যখন কানের ভিতর দিয়া তাহার মরমে পশিবে, তখন নিশ্চয়ই এই হৃদ্‌রোগ—এই জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে নয়। আজিও দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ঠাকুরের কীর্ত্তন শেষ হইতেছে না দেখিয়া, বেশ্যা উষি-পুষি করিতে লাগিল।

"রাত্রি শেষ হৈল বেশ্যা উষি-পুষি করে।"

বেশ্যাটীর অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর হরিদাসের প্রাণ দয়ায় গলিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "দেখ, এক মাসে এক কোটী নাম জপ করা আমার ব্রত। তাহা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, অদ্য রজনীতেই এক কোটী সংখ্যা সমাপ্ত করিতে পারিব। কিন্তু তাহা হইল না, তাই তোমার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। কল্য সংক্রান্তি। কল্যই ব্রত সমাপ্ত করিতে পারিব। তুমি এজন্য মনে দুঃখ করিও না। আবার আসিও।" হরিদাস ঠাকুরের মুখে এই প্রকার স্নেহপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বেশ্যার নিরাশ প্রাণে আশার আলোক ফুটিল। রমণীহৃদয়ের কোমলতম স্থানে যাইয়া একটা কোমল আঘাত পড়িল, সে ঠাকুরকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিল।

বেশ্যাটী সর্ব্বপ্রথমে রামচন্দ্র খানের প্রতিশ্রুত অর্থের লোভেই আসিয়াছিল। মায়ামমতা বলিয়া যে একটা জিনিষ, তাহা বেশ্যাদের প্রাণে প্রায়ই থাকে না। তাহার প্রাণেও উহা

বড় একটা ছিল না। হরিদাসকে দুষ্ক্রিয়া্য রাত জাগিয়া
করিয়া, রামচন্দ্র তাঁহাকে শূলেই চড়ান, কি জী৷ীয় মহিমা!
পোড়ান, তাহাতে তাহার কি আসে যায়? তাহার‑ত করিতে
হইল। অর্থের লালসাতেই সে একার্য্যে প্রবৃত্ত হ‑হইয়াছে,
ইহার সঙ্গে আর একটা ব্যাপারও ছিল। উহা তাহা‑বনামে
যৌবনের স্পর্দ্ধা। যাহার গায়ে একটু বেশী জোর আছে,শনে
ব্যক্তি কথায় কথায় যার তার সঙ্গে লড়িতে যায়, এবং কাহাকে‑র
বলে পরাস্ত করিতে পারিলে, মনে মনে একটা গর্ব্ব অনুভব
করিয়া থাকে। সেইরূপ যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিতা চরিত্রহীনারাও,
বুঝিবা কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড জয় করিতে পারে, মনে মনে এরূপ
একটা স্পর্দ্ধা রাখে।

আজ কিন্তু বেশ্যাটার মনের ভাব অন্য রূপ। সে হরিদাস ঠাকুরের রূপে—শুধু রূপে নয়, গুণেও মুগ্ধ হইয়াছে। সুতরাং রামচন্দ্র খানের হাতে ঠাকুরকে ধরাইয়া দিবার কথা কি আর সে ভাবিতে পারে? তথাপি খবরটা তাঁহাকে না জানাইলে নয়, তাই সে রামচন্দ্রের কাছে যাইয়া এই রাত্রের বৃত্তান্ত সমস্ত বলিল। কিন্তু মনে মনে বোধ হয় বলিতেছিল যে, যদি আজ ঠাকুরের কৃপা হয়, তবে সে আর গৃহে ফিরিবে না।

রমণী আজ গৃহে যাইয়া সারাদিন কেবল হরিদাস ঠাকুরের কথাই ভাবিল। আজ ঠাকুরের সমস্তই সে সুন্দর দেখিতেছে। হরিদাসের ললাটে তিলক, কণ্ঠে তুলসীর মালা ও রসনায় সুধামাখা হরিনাম, এ সমস্তই তাহার নিকট বড় সুন্দর—বড়

মধুর জ্ঞান হইতে লাগিল। আজ সন্ধ্যাকালে যুবতী আপনাকে এক নূতন সাজে সাজাইল—গলে তুলসীর মালা পরিল, ভালে গোপীচন্দনের তিলক রচনা করিল এবং সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম লিখিল। এইরূপে হরিদাসী সাজিয়া মুখে হরিনাম করিতে করিতে হরিদাসের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

"পর দিন গলে দিয়া তুলসীর মালা,
গোপী চন্দন দিয়া ভালে তিলক রচিলা।
অঙ্গে হরিনাম লিখি বৈষ্ণবী সাজিলা,
তবে সন্ধ্যাকালে হরিদাস স্থানে আইলা।"

(শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ)

আসিয়া সেই নারী পূর্ব্বের ন্যায় তুলসী ও ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া কুটীরের দুয়ারে যাইয়া বসিল। হরিদাস একান্ত মনে হরিনাম করিতেছেন। বসিয়া বসিয়া বেশ্যাও মাঝে মাঝে হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। কারণ হরিনাম তাহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। তাহা ছাড়া হরিদাস ঠাকুরের মন পাইবার নিমিত্ত একটু ছলনাও ছিল।

"বৃন্দা নমস্করি বসি কুটীর দুয়ারে,
ছলে বেশ্যা হরি হরি কহে উচ্চৈঃস্বরে।"

(শ্রীঅঃ প্রঃ)

অদ্য মাসের সংক্রান্তি। অদ্যই ঠাকুর হরিদাসের কোটী নাম-জপ পূর্ণ হইবে। সেই নারীর বাসনাও বুঝি আজ অপূর্ণ থাকিবে না। নামসংকীর্ত্তনে নিশি প্রায় অবসান হইয়াছে।

আজ বেশ্যাটীও হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে সারা রাত জাগিয়া হরিনাম করিয়াছে। সাধুসঙ্গের কি অচিন্তনীয় মহিমা! হরিনামের কি অপ্রতিহত প্রভাব! হরিনাম করিতে করিতে আজ সেই রমণী কখনও রোমাঞ্চিত, কখনও অশ্রুসিক্ত হইয়াছে, কখনও বা প্রাণের আবেগে অস্থির হইয়া কাঁদিয়াছে। হরিনামে যে এত শক্তি, এত রস, এত মাধুরী, তাহা ত সে আগে জানে নাই। বেশ্যা আর আজ বেশ্যা নাই। জগন্মঙ্গল হরিনামের অমৃত-রস হৃদয়ে পশিয়া আজ তাহার সমস্ত চিত্ত-বৃত্তি নির্ম্মল করিয়া দিয়াছে! আর বেশ্যা বলিও না—যদি চক্ষু থাকে, চাহিয়া দেখ—দেবী!

রমণী কি বাসনা হৃদয়ে লইয়া হরিদাস ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিল, আর দেখ, আজ তাহার প্রাণের অবস্থা কি! সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার-বিনাশের ন্যায় সেই ছার অর্থের প্রলোভন, সেই রূপের লালসা, সেই নীচ সুখের কামনা, আজ তাহার হৃদয় হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! আজ সে চায় ভক্তি, সে চায় মুক্তি! "ঠাকুর! কৃপা কর, কৃপা কর; পাপীয়সী নারকী আমি; রামচন্দ্রের প্রেরিতা পিশাচিনী আমি ঠাকুর। গুরুদেব! কৃপা কর, ক্ষমা কর, মুক্তি দাও, ভক্তি দাও" বলিয়া অনুতপ্তা নারী হরিদাস ঠাকুরের চরণতলে পড়িয়া কাঁদিয়া লোটাইতে লাগিল।

"দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে ঠাকুর-চরণে
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে।

বেশ্যা হৈয়া মুঞি পাপ করিয়াছি অপার।
কৃপা করি কর মুঞি অধমে নিস্তার।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

"হরিদাসে প্রণমিয়া কহে যোড় করে,
তুঁহু চুম্বক মহামণি আকর্ষিলা মোরে।
তুঁহু প্রভু গুরু দয়াময় কল্পবৃক্ষ,
মোক্ষফল দেহ মোরে হইয়া সপক্ষ।"

(শ্রী অঃ প্রঃ)

সেই শুভ সংক্রান্তির দিনে,—সেই রাত্রি-দিনের শুভ সন্ধিক্ষণে—ঠাকুর হরিদাস রমণীর 'মনের বাসনা' পূর্ণ করিলেন, তাহাকে 'অঙ্গীকার' করিলেন—হরিনাম-প্রদানে তাহাকে কৃতার্থ করিলেন।

"হরিনাম দিলা কর্ণে শক্তি সঞ্চারিয়া।"

(শ্রী অঃ প্রঃ)

অতঃপর হরিদাস কহিলেন, "আমি খানের দুরভিসন্ধি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সে নিতান্ত অজ্ঞ, মূর্খ, সেজন্য তাহার আচরণে আমার দুঃখ নাই। তুমি যখন প্রথম দিন এখানে আসিয়াছিলে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি এস্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতাম। এই তিন দিন এখানে রহিয়াছি—কেবল তোমাকে নাম দিবার নিমিত্ত।"

অভাগিনীর কি ভাগ্য! কিসের লাগিয়া আসিয়াছিল, আর আসিয়া কি পরম বস্তু লাভ করিল! হরি! হরি! সে চক্ষের

কথা ..না কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঠাকুর! ে াস্থা হইয়াছিল,
কি গুণে যে আমার মত হতভাগিনীকে তুমি কৃপা
তুমিই জান ঠাকুর। প্রভো! তুমি নিজগুণে কৃপা র,
স যে পরম বস্তু দান করিয়াছ, কেমন করিয়া আমি
রক্ষ রব? এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? বলিয়া দাও।
বটে ম মধুর, বড়ই মধুর। কিন্তু ঠাকুর! প্রাণে বড়
জ্বা কিসে জ্বালা যায়, কেমন করিয়া আমি হরিনাম-রসে
পারিব, তাহার সন্ধান আমায় বলিয়া দাও।"

াকুর হরিদাস বলিলেন, "বাছা! আর ভয় নাই। তোমার
দ্রব্যজাত ব্রাহ্মণকে দান করিয়া আমার এই কুটীরে
া তুমি নিরন্তর ভজন কর, আর ত র হয়। া কর
ত অচিরেই শ্রীগোবিন্দের চ
বে।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

"ঠাকুর কহে
এই ঘ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চাঁদপুরে

সাধু ভক্ত মহাপুরুষেরা এই সংসারের কিছুতেই আবদ্ধ-
হন। কোনও ব্যক্তি, বস্তু বা স্থান তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে
রে না। তাঁহারা বাঁধা পড়িয়াছেন—কেবল ভগবানের ঐ রাঙ্গা
রণে। কেবল মাত্র ভগবদিচ্ছারই প্রেরণায় তাঁহারা মুক্তা-
কাশের বিহঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।

আমাদের ঠাকুর হরিদাস তাঁহার সেই অতিপ্রিয় ভজন-স্থল বেণাপোলের জঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে চাঁদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বলরাম আচার্য্য নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের গৃহে যাইয়া আশ্রয় লইলেন।

"হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চাঁদপুরে,
আসি রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

এই চাঁদপুর সুপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। সপ্তগ্রাম বর্ত্তমান হুগলী হইতে বেশী দূরে নয়। বাদশাহি আমলে ঐ স্থানে সাতটি বড় বড় গ্রাম লইয়া একটি সমৃদ্ধিশালী নগরের পত্তন হইয়াছিল। এ নিমিত্ত উহা সপ্তগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ। চলিত কথায় উহার নাম সাতগাঁ। উহা পুরাতন সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে সেই স্রোতস্বিনীর স্রোতঃ শুকাইয়া লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়াছে। তৎকালে মজুমদার উপাধিধারী স্বনামধন্য হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস দুই সহোদর সপ্তগ্রামের ভূম্যধিকারী ছিলেন। হিরণ্য জ্যেষ্ঠ, গোবর্দ্ধন কনিষ্ঠ, জাতিতে কায়স্থ। তাঁহারা সপ্তগ্রামে থাকিয়া গৌড়ের বাদশাহ হোসেন সাহার প্রতিনিধি কর্ম্মচারীরূপে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের জমিদারির বার্ষিক উপস্বত্ব ছিল বার লক্ষ টাকা।

বলরাম আচার্য্য হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের কুল-পুরোহিত। আচার্য্য শান্ত দান্ত সদ্‌ব্রাহ্মণ ও সুপণ্ডিত। বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্রে

তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। এই কারণে সদাচারপরায়ণ হিরণ্য-গোবর্দ্ধন দুই সহোদরের নিকট তাঁহার বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। ঠাকুর হরিদাসের আগমনে বলরাম আচার্য্য যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। ঠাকুরের নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার পবিত্র সঙ্গ পাইবার নিমিত্ত, আচার্য্যের প্রাণে বহুদিন হইতেই একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই হরিদাস ঠাকুর আজ আপনা হইতেই আসিয়া অতিথিরূপে অকস্মাৎ তাঁহার গৃহে উপস্থিত। ইহাতে আচার্য্যের আনন্দের অবধি রহিল না। বলরাম পরমাদরে ঠাকুরের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং একটি নির্জ্জন পর্ণশালায় তাঁহার ভজনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ঠাকুর তথায় থাকিয়া আপন মনে দিবারাত্রি নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী বলরাম আচার্য্যকে "হরিদাসের কৃপা-পাত্র" বলিয়াছেন। ইহাতে নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, বলরাম আচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের স্থানে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হিরণ্য-গোবর্দ্ধন দুই ভাই হরিদাস ঠাকুরের বৈরাগ্য, কঠোর সাধনা ও প্রেম-চেষ্টার কথা পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। এক্ষণে পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের মুখে তাঁহার চাঁদপুরে আগমন-প্রসঙ্গে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া উভয়ে ঠাকুরের দর্শনার্থ লালায়িত হইলেন। হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস পরম বৈষ্ণব। উভয়েই বিদ্যোৎসাহী ও শাস্ত্রানুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের সভায় নিত্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ উপস্থিত থাকিয়া শাস্ত্র চর্চ্চা

করিতেন। আপনারাও দুই ভাই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা আচার্য্যের মুখে হরিদাস ঠাকুরকে একান্ত মিনতি করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তিনি নিজগুণে কৃপা করিয়া একবার আসিয়া তাহাদের সভায় পদধূলি দেন, তবে দুই সহোদর পরম চরিতার্থ হইবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যিনি জন-কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার নিমিত্ত বেণাপোলের জঙ্গলে যাইয়া লুকাইয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী, আর যিনি দিবারাত্রি একান্ত ভজনে রত, সেই ঠাকুর হরিদাস কি এরূপ একটি বহুলোকসমাগমপূর্ণ রাজসভায় যাইতে স্বীকৃত হইবেন? কিন্তু মহাপুরুষদিগের চেষ্টাচরিত্র বুঝিবার অধিকার আমাদের নাই। যখন বলরাম আচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের নিকট যাইয়া হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় গমনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখন ঠাকুর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন।

পরদিন ঠাকুর হরিদাস বলরাম আচার্য্যকে সঙ্গে করিয়া হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মানুষ হইলেও হরিদাস ঠাকুরের চেহারার ভিতরে অমানুষিক কিছু ছিল। এমন মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য নরলোকে দুর্ল্লভ। বরাঙ্গ মহিমাময়, মহা তেজস্বী। নয়নে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। কিন্তু দৃষ্টি স্থির ও স্নেহসিক্ত। ঠাকুর বয়সে প্রৌঢ়-যুবা, কিন্তু দেখিতে প্রবীণের ন্যায়। ফলতঃ হরিদাস ঠাকুর যখন সভাস্থলে আসিলেন, তখন সকলের জ্ঞান হইল, যেন একটি দেব-বিগ্রহ আসিয়া তথায়

উপস্থিত হইলেন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধন দুই ভাই ঠাকুরের চরণ-তলে পড়িয়া প্রণাম করিলেন এবং সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বতন্ত্র আসনে বসাইলেন।

"ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান,
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান।"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

সেই সভায় যে সকল বড় বড় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও ঠাকুর হরিদাসের সৌম্য, শান্ত, ভক্তি-বিলসিত, উজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সম্ভ্রান্তচিত্ত হইলেন এবং অশেষ প্রকারে তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের মনে একটা ভয় ছিল, না জানি, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ ঠাকুরকে কি ভাবে গ্রহণ করেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের এই প্রকার অনুকূল ভাব ও শিষ্টাচার দেখিয়া দুই ভ্রাতা আশ্বস্ত ও সুখী হইলেন।

"হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে,
শুনিয়া সে দুই ভাই ডুবিল বড় সুখে।"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

ঠাকুর হরিদাস প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম জপ করেন, শুদ্ধ এই কথাটা জানিতে পারিয়াই পণ্ডিতগণ যেমন বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, তদ্রূপ হরিদাস ঠাকুরের প্রতি তাঁহাদিগের একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধাও জন্মিয়াছিল। সেই সভায় তাঁহারা ঠাকুর হরি-দাসের প্রশংসা-প্রসঙ্গে নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও অনেক কথা তুলিলেন। কেহ বলিলেন যে, হরিনামের শক্তিতে জীবের

পাপ-তাপ বিনষ্ট হয়। কেহ বা বলিলেন যে, হরিনামে জীবের মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। এইরূপে পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-বচন দেখাইয়া এক এক জনে এক এক প্রকার বলিলেন।

"তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন গ্রহণ,
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ।
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপ ক্ষয়,
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়।
(শ্রীচৈঃ চঃ)

ঠাকুর হরিদাস গম্ভীর হইয়া সমস্ত শুনিলেন। পরে পণ্ডিত-গণকে সম্বোধনপূর্ব্বক করযোড়ে বলিলেন, "আপনারা যদি আমার অপরাধ গ্রহণ না করেন, তবে এ বিষয়ে আমি কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। আপনারা যাহা যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য। হরিনামে যে পাপনাশ ও মোক্ষলাভ হয়, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি নিবেদন করিতেছি যে, হরি-নামের ফল এই পর্য্যন্তই নহে। হরিনামে জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হইয়া থাকে।"

"হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নহে,
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে।"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

অর্থাৎ এই প্রকারে ভক্তি আচরণ করাই যাঁহার ব্রত, সেই ভক্ত নিজপ্রিয় ভগবানের নাম কীর্ত্তন দ্বারা জাতপ্রেমা হইয়া বিগলিতচিত্ত হয়েন। এ নিমিত্ত নানা ভাবে কখনও উচ্চ হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও চীৎকার, কখনও গান, আর কখনও বা নৃত্য করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার ক্রিয়া-মুদ্রা সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না।

"প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়,
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়।
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্‌গদ বৈবর্ণ্য,
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য।
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়,
কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায়।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

ঠাকুর হরিদাস পুনরপি কহিতে লাগিলেন—"মুক্তিলাভ হরি-নাম গ্রহণের চরম ফল নহে। মুক্তিলাভ শুদ্ধ নামাভাস হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্তস্থল অজামিলের উদ্ধার। অজামিল নারায়ণপরায়ণ ছিলেন না। নারায়ণ-নামে তাঁহার শ্রদ্ধাবুদ্ধিও ছিল না। কিন্তু আসন্ন-মৃত্যুর ভয়ে তিনি যে তাঁহার পুত্রের নাম ধরিয়া 'বাবা নারায়ণ', 'বাবা নারায়ণ' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং হরিনামে মুক্তি লাভ করা একটা বেশী কথা নয়। অপিচ, হরিনাম গ্রহণের ফলে জীব পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ

পরা ভক্তিলাভের অধিকারী হইয়া থাকে। পাপনাশ কি মুক্তিলাভ নাম-গ্রহণের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। ভক্ত যখন একবার শুদ্ধ-ভক্তিরসের আস্বাদন পান, হৃদয়ে যখন প্রেম জন্মে, তখন তাহার তুলনায় মুক্তি অতি তুচ্ছ ফল বলিয়া বিবেচিত হয়। যিনি ভক্তিধন লাভ করিয়াছেন, তিনি মুক্তি (ব্রহ্ম-সাযুজ্য) চাহেন না।"

"হরিদাস কহে কেন করহ সংশয়,
শাস্ত্রে কহে নামাভাস মাত্র মুক্তি হয়।
ভক্তিসুখ-আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়,
অতএব ভক্তগণে মুক্তি না ইচ্ছয়।
আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি, পাপনাশ,
তাঁহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত হরিদাস-ঠাকুর ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামিকৃত একটি সুমধুর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া পণ্ডিতগণকে বলিলেন, "অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনারাই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনাইয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

"অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য
তরণিরিব তিমিরজলধে-
র্জয়তি জগন্মঙ্গলহরের্নাম।"

অর্থাৎ অন্ধকার-সমুদ্রে সূর্য্যের ন্যায়, উদয়োন্মুখ অবস্থাতেই সকল লোকের সর্ব্বপ্রকার পাপান্ধকারহারী জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন।

পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ আনন্দের সহিত উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন। পরে ঠাকুর হরিদাসের মুখে উহার ব্যাখ্যান শুনিবার নিমিত্ত একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর হরিদাস তাঁহার স্বভাব-সুলভ বিনয়ের সহিত পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুরোধ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রকারে ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন—

"সম্যক্‌রূপে সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই অন্ধকার তিরোহিত হয়। অর্থাৎ অন্ধকার বিনাশ হইবার জন্য আর সম্যক্‌রূপে সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা থাকে না। আবার চোর, প্রেত ও রাক্ষসাদির ভয়ও সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই দূরীভূত হয়। অর্থাৎ উহাদিগহইতে আর কোনও রূপ অনর্থের আশঙ্কা থাকে না। সম্পূর্ণরূপে সূর্য্য সমুদিত হইলে জীব তখন ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও মঙ্গলের প্রকাশ দেখিয়া সুখী হয়।"

"হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমোক্ষয়,
চোর, প্রেত, রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ;
উদয় হৈলে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, মঙ্গল প্রকাশ।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

হরিনাম সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। সূর্য্যোদয়ারম্ভে তমো-বিনাশের ন্যায়, চিত্তমধ্যে নামের উদয় হইতে না হইতেই পাপান্ধকার দূরে পলায়ন করে এবং কোনও ভয় বা অনর্থের আশঙ্কা থাকে না। অর্থাৎ নামাভাসেই পাপ-তাপ দূর হইয়া অনর্থের নিবৃত্তি হয়—মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু যখন সেই জগন্মঙ্গল হরিনাম সমুদিত হয়েন অর্থাৎ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন, তখন পরম মঙ্গল-পদ কৃষ্ণপদে প্রেম জন্মিয়া থাকে।"

"তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়,
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

হরিদাস ঠাকুরের ব্যাখ্যা শুনিয়া পণ্ডিতগণ শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিলেন। কিন্তু হরিনদীগ্রাম-নিবাসী গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণের প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী। তিনি ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত, উৎকট তার্কিক। এজন্য বলরাম আচার্য্য তাঁহার 'ঘট-পটিয়া' আখ্যা দিয়াছিলেন। পণ্ডিতের তর্কশুষ্ক প্রাণে ভক্তির মহিমা ও নাম-মাহাত্ম্য স্থান পাইল না। ব্রাহ্মণ ক্রোধান্ধ হইয়া ঠাকুর হরিদাসের কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—

"সভাস্থ পণ্ডিতবর্গ! এই ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুনিলেন ত? বলে কি না, নামাভাসেই মুক্তিলাভ হয়! কোটী জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান

দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর, নামাভাসেই তাহা লব্ধ হয় ? কি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা !” ব্রাহ্মণ, ঠাকুর হরিদাসের পানে চাহিয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন—“ওহে বাপু ! যদি নামাভাসে মুক্তি না হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, আমি গোপাল শর্ম্মা তোমার নাকটি কাটিয়া ছাড়িয়া দিব ।”

‘গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ,
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান ।
পরম সুন্দর পণ্ডিত নবীন যৌবন,
‘নামাভাসে মুক্তি’ শুনি না হয় সহন ।
ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন,
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ ।
কোটী জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি না পায়,
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয় ।
বিপ্র কহে নামাভাসে মুক্তি যদি নয়,
তবে তোমার নাক কাটি, করহ নিশ্চয় ।”

(শ্রী চৈঃ চঃ)

ব্রাহ্মণেব মুখে এই প্রকার অসঙ্গত কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থ পণ্ডিতগণ ও হিরণ্য-গোবর্দ্ধন দুই সহোদর হাহাকার কবিতে লাগিলেন ।

“শুনি সব সভা উঠি করে হাহাকার,
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ।”

(শ্রী চৈঃ চঃ)

সভাশুদ্ধ লোক ঠাকুর হরিদাসের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"আপনাদিগের কিছুমাত্র দোষ নাই। এই ব্রাহ্মণেরও কোনও দোষ আমি দেখিতেছি না। ইহাঁর তর্কনিষ্ঠ মন। তাই ইনি ভক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন নাই। আপনারা আমার সম্বন্ধে মনে কিছু দুঃখ রাখিবেন না। এক্ষণে সকলে গৃহে গমন করুন। কৃষ্ণ আপনাদিগের মঙ্গল করুন।"

"সভা সহিতে হরিদাসের পড়িলা চরণে,
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে—
তোমা সবার কি দোষ? এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠ মন।
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব,
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব?
যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার,
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কাহার।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

উক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে ঠাকুর হরিদাসের সহিত গোপাল চক্রবর্ত্তীর যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, শ্রীল বৃন্দাবন দাস তাঁহার লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহা আরও একটু বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কিঞ্চিৎ এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

গোপাল চক্রবর্ত্তী বলিলেন—

"ওহে হরিদাস! এ কি ব্যাভার তোমার,
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার?
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়,
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়?
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে?
এই ত পণ্ডিত-সভা, বলহ ইহাতে।"
"হরিদাস বলেন—ইহার যত তত্ত্ব,
তোমরা সে জান হরিনামের মাহাত্ম্য।
তোমরা সবার মুখে শুনিয়া সে আমি,
বলিতে কি বলিলাঙ যেবা কিছু জানি।
উচ্চ করি লইলে শত গুণ পুণ্য হয়,
দোষ ত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়।"
"বিপ্র বলে—উচ্চ নাম করিলে উচ্চার,
শত গুণ ফল হয় কি হেতু ইহার?"
"হরিদাস বলেন—শুনহ মহাশয়,
যে তত্ত্ব ইহার বেদ ভাগবতে কয়।
পশু, পক্ষী, কীট আদি বলিতে না পারে,
শুনিলেই হরিনাম তারা সবে তরে।
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে,
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে।
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে,
শত গুণ ফল হয় সর্ব্ব-শাস্ত্রে বলে।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে সুদর্শনবাক্যং—

যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেবচ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদাহি তে॥

অর্থ—"জীব যাঁহার একটি মাত্র নাম কেবল উচ্চারণ করিতে করিতেই আপনাকে এবং আপনার ন্যায় নিখিল শ্রোতৃবর্গ ও সেই শ্রোতৃবর্গের সংসর্গীদিগকে সদ্যই পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই তোমার চরণ-স্পৃষ্ট হইয়া আমিও যে নিশ্চয়ই আপনাকে ও আর আর সকলকে অধিকতর রূপে পবিত্র করিব, তাহার আর কথা কি?"

তথাহি নারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যং—

যপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ॥

অর্থ—"যে ব্যক্তি মনে মনে হরিনাম জপ করেন, তাঁহার অপেক্ষা উচ্চকণ্ঠে নাম জপকারী যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা যুক্তিযুক্ত কথা। কারণ, মনে মনে জপকারী কেবল আপনাকেই পবিত্র করেন, আর উচ্চৈঃস্বরে জপকারী আপনাকে এবং শ্রোতৃবৃন্দকেও পবিত্র করিয়া থাকেন।"

"সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন,
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা দুর্ব্বচন—
দরশনকর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস!
কালে কালে বেদ-পথ হয় দেখি নাশ।

যুগশেষে শূদ্রে বেদ করিবে বাখানে,
এখনই দেখি তাহা শেষে আর কেনে ?
যে ব্যাখ্যা করিলি তুই এ যদি না লাগে,
তবে তোর নাক কান কাটি তোর আগে।”

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

মহতের লঙ্ঘনের যে ফল, এ ক্ষেত্রেও তাহা ফলিল। সত্য বটে, যিনি ভগবদ্ভক্ত, তিনি কখনও নিজের প্রতি অপরাধকারীর অপরাধ গ্রহণ করেন না। কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্ত-নিন্দা সহিতে পারেন না। কিসে কি হয়, তাহা আমরা জানি না এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিয়া যাহা জানি, মূঢ়তা বশতঃ দু’দিন পরে তাহাও মানি না। অভিমান-উষ্ণ অন্তঃকরণে “ধর্ম্মের কাহিনী” দাঁড়ায় না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সেই দিনই গোপাল চক্রবর্ত্তীকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিয়া দিলেন। গোপালের আর যে দুর্দ্দশা হইল, তাহা শুনিতে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।

“তিন দিন মধ্যে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল,
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল।
চম্পক-কলিকা সম হস্তপদাঙ্গুলী
কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি।
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল,
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল।
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে,
কৃষ্ণস্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে।”

(শ্রী চৈঃ চঃ)

সাক্ষাৎ দয়ার বিগ্রহস্বরূপ ঠাকুর হরিদাস বলরাম আচার্য্যের মুখে ব্রাহ্মণের উক্তরূপ শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়া অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলেন না। ফলতঃ ঠাকুর ব্রাহ্মণের দুঃখে প্রাণে এতই ব্যথা পাইয়াছিলেন যে, সেই দিনই তিনি চাঁদপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

"বিপ্রের দুঃখ শুনি হরিদাসের দুঃখ হৈলা,
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুরে আইলা।"
(শ্রী চৈঃ চঃ)

এই চাঁদপুর গ্রামে ঠাকুর হরিদাস পরবর্ত্তী কোনও সময়ে আরও একবার আসিয়াছিলেন। তখন গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস অল্পবয়স্ক বালক। রঘুনাথ বলরাম আচার্য্যের নিকট যাইয়া প্রতিদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিত। এমন সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন প্রখরমেধাশালী বালক আচার্য্যের টোলে ইতিপূর্ব্বে আসে নাই। এত বড় বাপের বেটা, কিন্তু বালকের চরিত্রে অভিমানের গন্ধমাত্র ছিল না। ঠাকুর হরিদাসের ভজনে আকৃষ্ট হইয়া রঘুনাথ একদিবস তাঁহার কুটীরের দ্বারে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুর তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন। এমন বিষয়-বিরাগী ত্যাগী পুরুষ হরিদাস ঠাকুর কিন্তু সেই দিন হইতে বালকটীকে একান্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। বালকটিও ভক্তির আকর্ষণে পড়িয়া প্রত্যহ দুই বেলা ঠাকুরের নিকট না আসিয়া থাকিতে পারিত না। এই বালকই উত্তরকালে

বৈরাগীর শিরোমণি রঘুনাথ দাস গোস্বামী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

"রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন,
হরিদাস ঠাকুরে নিত্য যাই করেন দর্শন।
হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে,
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শান্তিপুরে

যে সময়ের প্রসঙ্গ হইতেছে, তৎকালে শান্তিপুরের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত লাউড় নামক এক গণ্ডগ্রামে ১৩৫৫ শকে শুভ মাঘী সপ্তমী তিথিতে তাঁহার জন্ম হয়। * পিতার নাম কুবের আচার্য্য ও মাতার নাম লাভা দেবী। কুবের আচায্য পরিণত-বয়সে শ্রীহট্ট হইতে গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে আসিয়া সপরিবারে বসবাস করেন।

---

* শ্রীগৌরাঙ্গকে সূতিকা-গৃহে দেখিতে যাইয়া শ্রীঅদ্বৈত বলিয়াছিলেন,—

"অহে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল,
তুয়া লাগি ধরাধামে এ দাস আইল।"

(শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ)

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব ১৪০৭ শকে। তখন শ্রীঅদ্বৈতের বয়স ৫২ বৎসর। সুতরাং অদ্বৈত প্রভুর জন্মসন ১৩৫৫ শক।

নবদ্বীপেও তাঁহার একটি বাস-ভবন ছিল। শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র তাঁহার প্রথম যৌবনে একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল কমলাক্ষ আচার্য্য, উপাধি ছিল বেদ-পঞ্চানন। পরে তিনি অদ্বৈত আচার্য্য নামে পরিচিত হয়েন। তিনি যেমন জ্ঞানী ছিলেন, ভক্তিশাস্ত্রেও তাঁহার তদ্রূপ প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও অসাধারণ অধিকার ছিল। এক কথায় বলিতে গেলে, আচার্য্য জ্ঞানের হিমালয় ও ভক্তির প্রশান্ত মহাসাগর ছিলেন। তিনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞির নিকট দীক্ষিত হইবার পর হইতে কখনও নবদ্বীপে এবং কখনও শান্তিপুরে থাকিয়া ভক্তিধর্ম্মাচরণ ও ভক্তি-শাস্ত্রের ব্যাখ্যান দ্বারা দেশের ও সমাজের কল্যাণ-ব্রতে ব্রতী হইলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুর এই উভয় স্থানেই তাঁহার টোল ছিল।

তৎকালে দেশমধ্যে ধর্ম্মের অবস্থা অতিশয় ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। লোকসকল কৃষ্ণভক্তিহীন ও একান্ত বহির্ম্মুখী। সমাজ নীরস, শুষ্ক—মরুভূমিতুল্য। আচার্য্য যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই দেখেন—কেবল পাপ, তাপ, জ্বালা। ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, দম্ভ ও অভিমান লইয়া লোকেরা সতত উন্মত্ত। তাহারা সুখের লাগিয়া সকল করিতেছে, কিন্তু প্রাণে সুখ পাইতেছে না। নরনারী শান্তিহারা। সমস্ত সংসার যেন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। যাহাতে ভব-রোগ দূর হয়, যাহাতে হৃদয়ের তাপ যায়, যাহাতে প্রাণ শীতল হয়, সেই পরম বস্তু—সেই বিষ্ণু-ভক্তি বিস্মৃত হইয়া জীব ত্রিতাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে।

ইহা দেখিয়া সেই মহান্ বিশ্বপ্রেমিক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। জীবের দুঃখ দিবানিশি তাঁহাকে বিহ্বল করিতে লাগিল। জীবের দুঃখ-তাপ দূর করিতে হইবে, ভক্তির অমৃত-সেকে জীবের প্রাণ শীতল করিতে হইবে, কৃষ্ণপ্রেমে সকলকে কাঁদাইতে হইবে, ইহাই প্রভু অদ্বৈতের প্রতিজ্ঞা। এই উদ্দেশ্যে আচার্য্য আপাততঃ কখনও নবদ্বীপে, আর কখনও বা শান্তিপুরে থাকিয়া ভক্তি-তত্ত্ব ব্যাখ্যান করিতে লাগিলেন, আর কাতরপ্রাণে অনুক্ষণ 'হা গোবিন্দ' বলিয়া ভক্তিদাতা ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঠাকুর হরিদাস শান্তিপুরে আসিলেন। অদ্বৈত-প্রভু তখন শান্তিপুরের বাটীতেই ছিলেন। হরিদাস প্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। আচার্য্য তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র চিনিলেন—ইনি হরিদাস ঠাকুর। হরিদাসকে দেখিয়া তাঁহার সুখের সাগরে তরঙ্গ উঠিল, কিন্তু তথাপি একটু ভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনি কে? কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন?"

হরিদাস ঠাকুর বিনয়-বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—

"প্রভো! আমি ক্ষুদ্র জীব; জাতিতে অধম ম্লেচ্ছ। আপনকার শ্রীচরণ-দর্শনমানসেই এ স্থানে আসিয়াছি।"

"ব্রহ্ম হরিদাস কহে মুঞি ম্লেচ্ছাধম,
আসিয়াছোঁ তুয়া পদ করিতে দর্শন।"

(শ্রীঅঃ প্রঃ)

হরিদাসের এই প্রকার দৈন্যোক্তি শুনিয়া আচার্য্য কহিলেন,—

"মহাশয়! কে ছোট, কে বড়, কে কোন্ জাতি, তাহা আমি সম্যক্ বুঝিতে অক্ষম। আমার মতে যাঁহার আচরণ সাধু, তিনিই শ্রেষ্ঠ; আর, যিনি বিষ্ণুভক্ত, তিনিই দ্বিজ।"

"কেবা ছোট কেবা বড় নৈর্ষা নাহি জানি,
সাধু আচরণ যাঁর তাঁরে শ্রেষ্ঠ মানি।
অষ্টবিধ ভক্তি যদি ম্লেচ্ছে উপজয়,
সেই জাতি লোপ হঞা দ্বিজাদেশ হয়।"

(শ্রীঅঃ প্রঃ)

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও ঠাকুর হরিদাস এত দিন দূরে দূরে থাকিয়াও, পরস্পরকে ভালরূপে জানিয়াছিলেন; দু'য়ের মধ্যে বিনা পরিচয়েও বিশিষ্ট পরিচয় হইয়াছিল। এক্ষণে উভয়ের সাক্ষাদ্দর্শনে উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, পরস্পর আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া প্রেমজলে ভাসিতে গলেন। এইরূপে ভক্তির দুইটি প্রবল প্রবাহ একত্র মিলিত হইয়া, উত্তরকালে কৃষ্ণভক্তির বন্যায় দেশ ভাসাইবে বলিয়াই যেন কিছু কালের জন্য একস্থানে থাকিয়া তোলপাড় করিতে লাগিল।

আচার্য্য গঙ্গার তীরে অতি নির্জ্জন প্রদেশে হরিদাস ঠাকুরের ভজনের নিমিত্ত একটি গোফা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ঠাকুর সেই গোফামধ্যে থাকিয়া পরম সুখে আপনার প্রিয় ব্রত অর্থাৎ

দিবারাত্রে তিন লক্ষ হরিনাম-জপ-রূপ ব্রত উদযাপন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষার অনুরোধে তিনি দিনের মধ্যে একবার অদ্বৈত-গৃহে গমন করিতেন। তদুপলক্ষে অদ্বৈত প্রভুর সহিত কৃষ্ণ-কথায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া গোফায় ফিরিয়া আসিতেন।

উল্লিখিত গোফা আর কিছুই নহে, মাটীর একটি গর্ত্তবিশেষ। গঙ্গার উচ্চ পাড়ে বহির্দ্দেশ হইতে খনন করিয়া একটি কোঠার ন্যায় করা। উহার একটি মাত্র দরজা—গঙ্গার দিকে। গোফার ভিতর ও সম্মুখভাগ গোময় দ্বারা লেপিত। দরজার এক পার্শ্বে গোময়-লেপিত বেদীর মধ্যস্থলে এক ঝাড় কৃষ্ণতুলসী। ঘরে বসিয়াই গঙ্গা-দর্শন হয়। ভজনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মনোরম স্থান আর কি হইতে পারে ?

এমন নির্জ্জন পবিত্র স্থান পাইয়া ঠাকুর হরিদাস মনের সুখে ভজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে স্থানে এক ফোঁটা মধু, সেই স্থানেই পিপীলিকার জাঙ্গাল! ইহা অনিবার্য্য। হরিদাস ঠাকুরের স্থানে একটি দুইটি করিয়া ক্রমে বহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল। অনেকেই তাঁহার ভক্ত হইলেন।

কথিত আছে, বুদ্ধদেব যখন নির্ব্বাণলাভের কামনায় গয়ার [illegible]রণ্যপ্রদেশে বোধিদ্রুমতলে পদ্মাসনে বসিয়া মহাসাধনায় নিমগ্ন, [illegible]কালে বারংবার মার আসিয়া নানা প্রকার বিভীষিকা ও [illegible]লাভন দেখাইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছিল। ভক্তির মহা[illegible]ক ঠাকুর হরিদাসের জীবনেও বারংবার লৌকিক ও

অলৌকিক পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবানের পাদপদ্মে যাঁহার চিত্তভৃঙ্গ নিত্যযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে কোনও প্রকারের বিভীষিকা-প্রলোভন দেখাইয়া বিচলিত করিতে পারে, এমত সাধ্য কার? বেণাপোলের ন্যায় এই শান্তিপুরের আশ্রমেও হরিদাস ঠাকুর এক পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়াছিলেন। এবারে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন স্বয়ং মায়া। ঘটনা অলৌকিক, কিন্তু তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কি আছে? এমন বহু ব্যাপার আছে, যাহা আমাদিগের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর।

হরিদাস ঠাকুর গোফাতে বসিয়া উচ্চকণ্ঠে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি। দশদিক্ সুনির্ম্মল। সম্মুখে জাহ্নবী তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া যাইতেছেন। গোফার সম্মুখে গোময়-সুলেপিত পিণ্ডার উপরে তুলসী-মহারাণী গায়ে জ্যোৎস্না মাখাইয়া হাসিতেছেন। সুন্দর ঠাকুর সুন্দর সুললিত কণ্ঠে গগনে পবনে হরিনামের মধু ছড়াইতেছেন। দেশ, কাল, পাত্র সকলই মধুর, সকলই মনোরম। এহেন কালে অঙ্গের সৌরভে দশদিক্ আমোদিত করিয়া ক্বণক্বণিতাভরণা কণক-বরণ এক কামিনী আসিয়া তুলসী-প্রণাম ও তুলসী-পরিক্রমা পূর্ব্বক সহসা ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

"হেন কালে এক নারী অঙ্গনে আইলা,
তাঁর অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা।

তৎপর
প্রেরে
পাদ্বাৎ

তাঁর অঙ্গগন্ধে দশদিক্ আমোদিত,
ভূষণের ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত।
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার,
তুলসী পরিক্রমা করি গেলা গোফা-দ্বার।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

সেই অলোকসামান্যা নারী হরিদাস ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া মৃদু-মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "ঠাকুর! তুমি জগতের বন্দনীয়। তুমি রূপবান্, গুণবান্। তুমি সাধু। দীন জনে দয়া করাই সাধুর স্বভাব। আমি তোমার কৃপার ভিখারী, আমাকে অঙ্গীকার কর।"

"মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়,
দীনে দয়া করে এই সাধু-স্বভাব হয়।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

নিরন্তর কৃষ্ণনামে আবিষ্টচিত্ত, নির্ব্বিকার, গম্ভীরাশয় ঠাকুর হরিদাস রমণীকে কহিলেন—

"দ্বারে বসি শুন তুমি নাম-সংকীর্ত্তন,
নাম-সমাপ্ত্যে করিব তোমার প্রীতি-আচরণ।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

সেই বেণাপোলের জঙ্গলে যেমন-যেমন হইয়াছিল, এই পতিতপাবনী সুরধুনীর তট-ভূমিতেও আবার তিন রাত্রি ব্যাপিয়া

যেন তাহারই পুনরভিনয় হইয়া গেল। তৃতীয় রাত্রির অবসান-কালে—

"তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার,
আমি মায়া, করিতে আসিলাম পরীক্ষা তোমার।
ব্রহ্মাদি জীব মুঞি সবারে মোহিল,
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল।
মহা ভাগবত তুমি, তোমার দর্শনে,
তোমার কীর্ত্তনে কৃষ্ণনাম-শ্রবণে
চিত্ত শুদ্ধ হৈল, চাহি কৃষ্ণনাম লৈতে,
কৃষ্ণ-নাম উপদেশি কৃপা কর মোতে।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

ঠাকুর হরিদাস কহিলেন—

"দেবি! আপনার চরণে নমস্কার। আমি অধম, ক্ষুদ্র কীট। আমার উপর এই পরীক্ষা! কিন্তু আমার মনে বড়ই কুতূহল হইতেছে,—আপনি কি নিমিত্ত কৃষ্ণনামের জন্য এরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন?"

মায়া বলিলেন—

"পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে,
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে।
মুক্তি হেতু তারক হয়েন রামনাম,
কৃষ্ণনাম পারক, করেন প্রেম দান।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

ঠাকুর হরিদাস পুনরায় হরিনামকীর্ত্তনে নিবিষ্ট হইলেন। মায়া ভক্তের মুখ-নিঃসৃত কৃষ্ণ নাম হৃদয়ে রোপন করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে লোকসমাগমও বাড়িয়া চলিল। এদিকে শ্রীঅদ্বৈত, ঠাকুর হরিদাসকে এত আদর, যত্ন ও সম্মান করিতে লাগিলেন যে, নিষ্কিঞ্চন হরিদাস ঠাকুর তাহাতে নিতান্তই কুণ্ঠিত হইলেন এবং এক দিন আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার কাছে আপনার মনের কথা অকপটে বলিয়া ফেলিলেন।

"হরিদাস কহে গোসাঞি করি নিবেদন,
মোরে প্রত্যহ অন্ন দাও কোন্ প্রয়োজন?
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন-সমাজ,
আমারে আদর কর না বাসহ লাজ।
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়,
সেই কৃপা করিবা যাতে মোর রক্ষা হয়।
আচার্য্য কহেন—তুমি না করহ ভয়,
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়।
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন,
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

হরিদাস ঠাকুর মহা বিপদে পড়িলেন। যিনি অপরকে মান দিবার জন্যই সতত সচেষ্ট, যিনি আপনাকে তৃণ হইতেও নীচ

দীনাতিদীন মনে করেন, এমন যে নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ঠাকুর হরিদাস, তিনি কি শ্রীঅদ্বৈতের এত মান-মর্য্যাদা সহ্য করিতে পারেন? ভাবিয়া দেখুন, ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্রান্ন ভোজন! বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কাহাকেও শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন ভোজন করান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। হরিদাস মনে মনে বলিলেন—'না, আর নয়।' প্রকাশ্যে অদ্বৈত প্রভুকে বলিলেন—

"অহে প্রভু আজ্ঞা দেহ যাঙ বিরলেতে,
অবিশ্রান্ত হরিনামামৃত আস্বাদিতে।"

প্রভু কহে, "তো বিচ্ছেদে মোর প্রাণ ফাটে,
নিষেধিতে না পারি ভজনের বিঘ্ন ঘটে।"

হরিদাস প্রভুপদে দণ্ডবৎ কৈলা,
প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে গাঢ় আলিঙ্গিলা।

হরিদাস কহে, "মুঞি অস্পৃশ্য পামর,
মোর অঙ্গ ছুঁই কেন অপরাধী কর?"

প্রভু কহে, "নাহি বুঝি সজাতি দুর্জ্জাতি,
যেই কৃষ্ণ ভজে সেই শ্রীবৈষ্ণব জাতি।"

হরিদাস কহে, "প্রভু, সকলি সম্ভবে,
তুয়া সুনির্ম্মল কৃপা যদি হয় জীবে।"
এত কহি করযোড়ে প্রভু আজ্ঞা লঞা,
ফুলিয়া গ্রামেতে গেলা হরি সঙরিয়া।"

(শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ)

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভজন-স্থান—বাবলা, শান্তিপুর। ৫১ পৃঃ

শান্তিপুরের উপকণ্ঠে * "বাবলা" নামক স্থানে ঠিক গঙ্গার উপর অদ্বৈত প্রভুর একটি নির্জ্জন ভজন-স্থান ছিল। তিনি অধিকাংশ সময়ই সেই স্থানে আপন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন। মাঝে মাঝে আসিয়া পড়ুয়াদিগকে পাঠ দিয়া যাইতেন। হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুর পরিত্যাগ করিলে পর অদ্বৈতাচার্য্য বাবলায় চলিয়া আসিলেন। চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া জীবের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তিনি সুরধুনীর তীরে সেই বাবলায় বসিয়া করপুটে গঙ্গাজলতুলসী লইয়া "হাঁ কৃষ্ণ, হা গোবিন্দ" বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ না হইলে ধর্ম্মের গ্লানি কে দূর করিবে? জগতে ভক্তির ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে তিনি ভিন্ন আর কে পারে? সেই গোলোকবিহারী ভূভারহারী শ্রীহরিকে ধরাধামে আনিতেই হইবে, প্রাণে এই আশা, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া

---

* শ্রীঅদ্বৈতের সেই ভজন-স্থান "বাবলা-পাট" নামে প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর সপ্তম দোলের দিন সেখানে মহোৎসব হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে শিক্ষিত-সমাজের বহু ভক্তসজ্জন সে স্থানে যাইয়া কীর্ত্তনোৎসব করিয়া থাকেন। সেই প্রাচীন স্থান আর সেই প্রাচীন গঙ্গার খাত অদ্যাবধি বর্ত্তমান। অতি মনোরম স্থান। স্থানের অসাধারণ প্রভাব অদ্যাবধি অনুভূত হইয়া থাকে। একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রীশ্রীসীতা-নাথের শ্রীবিগ্রহ পূজিত হইয়া থাকেন। মন্দিরটির অবস্থা শোচনীয়। সম্মুখে একটি নাটমন্দির আছে। তাহার একাংশ ভূমিসাৎ হইয়াছে। যাঁহার হুঙ্কারে শ্রীগৌরাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গে আসিয়াছিলেন, সেই সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈতের এই আদি ভজন-স্থলীর প্রতি বৈষ্ণব-সাধারণের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

অদ্বৈত-সিংহ রোমাঞ্চিত-কলেবরে শ্রীগোবিন্দের নামে ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হরিদাস ঠাকুর এক্ষণে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই ফুলিয়া গ্রাম বাবলা হইতে অল্প ব্যবধান মাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফুলিয়ায়

ফুলিয়া শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম। পূর্ব্বে ইহার পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। অদ্যাবধি তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে সুরধুনী ভিন্নপথগামিনী। শান্তি-পুরের ন্যায় ফুলিয়াও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের স্থান—বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ব্রাহ্মণ-সমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন "ফু'লেব মুখুটি"দিগের আদি বাসস্থান এই ফুলিয়া। আর, যিনি সরল-সুললিত পদ্যে রামায়ণ রচনা করিয়া বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষাকে এক অপূর্ব্ব মৃত-সঞ্জীবনী-রসে সরস করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গের সেই অমর-কবি অক্ষয়-কীর্ত্তি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি এই ফুলিয়া। ঠাকুর হরিদাসের শান্তিপুরে অবস্থানকালে তাঁহার সুনাম শুনিয়া ফুলিয়া-সমাজের ব্রাহ্মণগণমধ্যে অনেকে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন এবং তাঁহার ভজন শুনিয়া প্রাণে শান্তিলাভ করিতেন। অধুনা তাঁহাকে স্বগ্রামে পাইয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

তাঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মিল যে, হরিদাস ঠাকুর যথার্থ সাধু, যথার্থ ভক্ত।

ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা ঠাকুর হরিদাসকে একটু বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, রামদাস পণ্ডিত তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। ইনি সুপণ্ডিত, ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ব্রাহ্মণের একান্ত ভক্তি জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ একদিন বিনীত-ভাবে হরিদাসকে বলিলেন,—'মহাশয়, আপনি সাধু, আপনার এস্থানে আগমনে আমরা ধন্য হইলাম। না জানি, এ গ্রামের কত পূর্ব্ব-সুকৃতি ছিল। যে স্থানে একজন সাধুব্যক্তি বাস করেন, সে স্থান পবিত্র হইয়া যায়। আপনি দয়া করিয়া আসিয়াছেন, বড়ই আনন্দের কথা। এ স্থানে কিছুকাল বাস করুন।"

হরিদাস ঠাকুর বলিলেন,—"দ্বিজবর! আমাকে যে ওরূপ বলিতেছেন, ইহাতে আমি নিতান্ত সঙ্কুচিত হইতেছি। আমি অস্পৃশ্য, নীচ জাতি। আপনারা ব্রাহ্মণ। বেদ বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ বিষ্ণুকলেবর। আমি যে আপনাদিগের সঙ্গ পাইলাম, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

> "ব্রহ্ম হরিদাস কহে—ওহে দ্বিজবর,
> বেদোক্তি ব্রাহ্মণ মাত্রে বিষ্ণুকলেবর।
> মুঞি নীচ জাতি হও নহে স্পর্শযোগ্য,
> তুয়া সঙ্গ পাইনু মোর এই মহাভাগ্য।"
>
> (শ্রী অঃ প্রঃ)

পণ্ডিত রামদাস বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি পরম ঈশ্বর-ভক্ত, সাধু। আপনি এই প্রকার দৈন্য করিতেছেন কেন? যিনি ঈশ্বরানুরাগী, তাঁহার জাতির গণনা হয় না। স্পর্শমণির স্পর্শ পাইলে যেমন লৌহ সুবর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ যাঁহার সহিত ঈশ্বরোপাসনার সংযোগ হইয়াছে, তাঁহার যে বর্ণই হউক না কেন, তিনি শ্রেষ্ঠ।"

"রামদাস কহে সাধু কাহে কর দৈন্য,
ঈশ্বরানুরাগী জনের জাতি নহে গণ্য।
যৈছে স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ হয় স্বর্ণ,
ঈশ্বরোপাসনে তৈছে শ্রেষ্ঠ সর্ব্ববর্ণ।"

(শ্রীঅঃ প্রঃ)

ইহার পর উভয়ের মধ্যে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। ঠাকুর হরিদাস সর্ব্বশেষে বলিলেন যে, যিনি সর্ব্বেশ্বর, সেই শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে, একমাত্র ভক্তিই তাহার পন্থা। জ্ঞানযোগে নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিঃ মাত্র অনুভূত হয়। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বমাধুর্য্য-পূর্ণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্‌কে ভক্তি ভিন্ন পাওয়া যায় না। ভক্তিলাভের উপায় হরিনাম। অবিশ্রান্ত হরিনাম-জপে প্রেমধন লাভ হইয়া থাকে।

"ব্রহ্ম হরিদাস কহে ভক্তিযোগ সার,
তাহে লভ্য হয় নিত্যব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর।

নিত্য ব্রহ্মবস্তু হয় স্বয়ং ভগবান্,
সচ্চিৎ আনন্দময় সর্ব্বশক্তিমান্।
হরিনাম হয় শুদ্ধভক্তির কারণ,
অবিশ্রান্ত জপে পায় নিত্য প্রেমধন।"

(শ্রীঅঃ প্রঃ)

পণ্ডিত রামদাসের মনে ঠাকুর হরিদাস সম্বন্ধে প্রথম দর্শনেই একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ইনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি, সিদ্ধ মহাপুরুষ। সুতরাং ঠাকুরের কথা ব্রাহ্মণ অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিলেন। হরিদাস ফাঁকা কথা কহেন নাই। প্রত্যেক কথাই তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ কথা। এজন্য তাঁহার প্রতি কথায়ই শক্তি ছিল। সেই শক্তির সঞ্চারে ব্রাহ্মণ রোমাঞ্চিত-কলেবরে ঠাকুর হরিদাসের স্থানে দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু যিনি তৃণাদপি সুনীচ, যিনি সকলের নিকট হাত যোড় করিয়াই আছেন, এমন যে বিনয়ের বিগ্রহস্বরূপ হরিদাস ঠাকুর, তিনি কি একজন সুবিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতে—তাঁহার গুরু হইতে স্বীকৃত হইবেন? ইহা ধারণা-যোগ্য নয়। কিন্তু ঠাকুর সেই স্থলেই এবং সেই ক্ষণেই কি এক ভাবের আবেশে ব্রাহ্মণকে শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক হরিনাম প্রদান করিলেন।

"শুনি দ্বিজ হঞা রোমাঞ্চিত-কলেবর,
কহে মোরে দয়া করি করহ সংস্কার।

তাহা শুনি হরিদাস প্রেমে পূর্ণ হঞা,
হরিনাম দিলা দ্বিজে শক্তি সঞ্চারিয়া।"

(শ্রীঅঃ প্রঃ)

সাধুমহাপুরুষদিগের চেষ্টা-চরিত্র, গতিবিধি সাধারণ মনুষ্যের বুদ্ধির অনধিগম্য। নির্জ্জন স্থানই ঠাকুর হরিদাসের প্রিয়, এবং নির্জ্জনে রহিয়াই তিনি আপন কুটীরে বসিয়া নিরন্তর হরিনাম জপ করিতেন, এত দিন আমরা তাহাই দেখিয়াছি। ফুলিয়ায় আসিয়া কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এখন হইতে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিলেন। হরিদাস ঠাকুর কখনও ফুলিয়ায়, কখনও বা শান্তিপুরে, এইরূপে নিরবধি সুরধুনীর তীরে তীরে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সহিত আসিয়া মিলিত হন, তখন উভয়ে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করেন এবং এমন হুঙ্কার-গর্জ্জন করেন যে, তাহাতে যেন গোলোকের আসন পর্য্যন্ত টলিয়া উঠে, আর সুরতরঙ্গিণী কোটি তরঙ্গ বিস্তার করিয়া যেন আপনার আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন।

"নিরবধি হরিদাস গঙ্গাতীরে তীরে,
ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে।
পাইয়া তাঁহার সঙ্গ আচার্য্য গোসাঞি,
হুঙ্কার করেন আনন্দের অন্ত নাই।

হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতদেব সঙ্গে,
ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র তরঙ্গে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকুর পরম ত্যাগী, পরম বৈরাগী—বৈরাগীর শিরোমণি, নিষ্কাম-ভক্তিযোগী। অষ্টপ্রহর গোবিন্দ নাম মুখে উচ্চারিত হইতেছে, ক্ষণেকের তরে তাহার বিরাম নাই। হরিনামগ্রহণের,হরিনামকীর্ত্তনের চরম ফল যে অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, তাহা তাঁহার লাভ হইয়াছে। নাম করিতে করিতে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব আসিয়া তাঁহার দেহ-মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে—তিনি আর স্ববশে থাকেন না। তাঁহার প্রাণের ভিতরে যে কি হয়, তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু লোকেরা দেখে যে, তিনি কখনও নৃত্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও গভীর গর্জ্জন, আর কখনও বা অট্টহাস্য করিতেছেন ! এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া ঠাকুর হরিদাস ফুলিয়া গ্রামে কালযাপন করিতেছেন।

'কখন করেন নৃত্য আপনা আপনি,
কখন করেন মত্ত সিংহপ্রায় ধ্বনি।
কখন বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন,
অট্ট অট্ট মহা হাস্য হাসেন কখন।
অশ্রুপাত, রোমহর্ষ, হাস্য, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম,
কৃষ্ণভক্তিবিকারের যত আছে মর্ম্ম।
প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে,
সকলি আসিয়া তাঁর শ্রীবিগ্রহে মিলে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

কাজীর অত্যাচার

তখনকার দিনে স্থানে স্থানে বিচারকর্ত্তা ছিলেন কাজী। "কাজীর বিচার" বলিলে আজকাল লোকেরা যাহা বুঝে, তখনকার কাজীর বিচার ঠিক তেমনই ছিল। তখন নবদ্বীপের কর্ত্তা ছিলেন চাঁদ কাজী, আর শান্তিপুরের দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতা ছিলেন গোড়াই কাজী। ঠাকুর হরিদাস মুসলমান ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এক্ষণে হিন্দুর ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন, বিশেষতঃ কাজী সাহেবের নিজের এলাকার মধ্যেই আসিয়া এতটা বাড়াবাড়ি করিতেছেন, গোড়াই কাজীর তাহা সহ্য হইল না। হরিদাস ঠাকুরকে অতি গুরুতর শাস্তি দিবার জন্য কাজী একেবারে গৌড়ে যাইয়া বাদশাহের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। অভিযোগের মর্ম্ম এই যে—

"গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম,
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্বস্থান।
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার,
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

গৌড়াধিপতি হোসেন শাহা এই অভিযোগ শুনিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং আপনার খাস-দরবারেই হরিদাসের বিচার করিবেন বলিয়া ইস্তাহার জারি করিলেন। ইহার কয়েক দিন পরেই ঠাকুর হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া যাইতে ফুলিয়ায়

পাইক-বরকন্দাজ আসিল। যিনি সকল ছাড়িয়া শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দ আশ্রয় করিয়াছেন—গোবিন্দচরণে স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আবার কিসের ভয়? পাইক-বরকন্দাজ, কাজী-বাদশার কথা দূরে থাকুক, যমের ভয়ও তিনি রাখেন না। নিত্য-যুক্ত হরিদাস ঠাকুর কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, পাইকেরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল, ফুলিয়া গ্রাম বিষাদে ডুবিল। এই সময়ে অদ্বৈতপ্রভু বোধ হয় নবদ্বীপে।

"কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়,
যবনের কি দায় কালের নাহি ভয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চলিলা সেইক্ষণে,
মুলুকপতির আগে দিল দরশনে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকুর যে দিন গৌড়ে পৌঁছিলেন, সে দিন তাঁহাকে বন্দিখানায় রাখা হইল। পরদিন তাঁহার বিচার। নানা শ্রেণীর বন্দিগণ বন্দিশালায় রহিয়াছে। তাহারা সকলেই ঠাকুর হরিদাসের অসামান্য উজ্জ্বল দেহ-প্রভা দেখিয়া তাঁহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাঁহার দর্শন-প্রভাবে ও তাঁহার মুখের হরিনাম শ্রবণে মহামহা অপরাধীদিগেরও প্রাণ ভক্তিরসে সিক্ত হইল। তাহারা যে কারাগারে রহিয়াছে, ক্ষণেকের তরে সে কথা ভুলিয়া গেল, চিত্তে বিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। বন্দিগণ আপন আপন স্থানে রহিয়াই ঠাকুরকে প্রণাম করিল।

আজানুলম্বিত-ভুজ কমল-নয়ন,
সর্ব্ব-মনোহর মুখ-চন্দ্র অনুপম।
ভক্তি করি সবে করিলেন নমস্কার,
সবার হইল কৃষ্ণ-ভক্তির বিকার।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বে পরের মাথায় লাঠি মারিয়াছে, কেহ বা জাল-জুয়াচুরি করিয়া অপরের সম্পত্তি গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এমন বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধিগণেরও চিত্ত তৎকালে ভক্তিরসে বিগলিত হইতে দেখিয়া ঠাকুর হরিদাস আনন্দিত হইলেন এবং প্রাণে প্রাণে সকলকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, আর যেন ইহারা বিষয়-পঙ্কে নিমগ্ন না হয় এবং ইহাদিগের প্রাণের এই নির্ম্মল অবস্থা, এই ভক্তির ভাব যেন স্থায়ী হয়। কিন্তু প্রকাশ্যে একটু বঙ্গ করিয়া বলিলেন— "তোমরা এখন যে ভাবে আছ, সকলে সেই ভাবেই থাক।"

"থাক থাক এখন আছহ যেরূপে,
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায় যে, হরিদাস ঠাকুর বড় রঙ্গী ছিলেন। সদানন্দ পুরুষ, কারাগারে আসিয়াও রঙ্গ। বন্দিগণ ঠাকুর হরিদাসের কথার প্রকৃত ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদকে অভিসম্পাত জ্ঞান করিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইল।

ঠাকুর হরিদাস ...দিগের মুখের ভাব দেখিয়াই সমস্ত
ঝিতে পারিলেন এবং সং... স্থ্য বলিলেন—

"বন্দী থাক হেন আশীর্ব্বা... গাহি করি,
বিষয় পাসর, অহর্নিশ বল হরি॥
এবে কৃষ্ণপ্রীতে তোমা সবাকার ম...
যেন আছে, এই মত থাকুক সর্ব্বক্ষণ।
ছলে করিলাম এই গুপ্ত আশীর্ব্বাদ,
তিলার্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

গৌড়ের দরবারে

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঠাকুর হরিদাসের চেহারাতে অসাধারণ কিছু ছিল—একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহা বিরোধী লোকের প্রাণও আপনা হইতেই সম্ভ্রমে নত হইত। মুলুকের অধিপতি হোসেন শাহা আজ পূরা দরবারে উজীর, নাজীব, মোল্লা, মৌলবী ও দেশের বড় বড় কাজী ও মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া বিচারাসনে উপবিষ্ট। আজ ঠাকুর হরিদাসের বিচার হইবে। সে বিচার দেখিবার জন্য দরবারগৃহ লোকে লোকারণ্য। ঐ যে হরিদাস ঠাকুর আসিতেছেন—বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, মুখে অবিরাম তারকব্রহ্ম-নাম। সেই অসাধারণ বন্দী আপন প্রভাবে সকলের চিত্ত চমকিত করিয়া বিচার-মঞ্চে উপনীত হইলেন। কিন্তু বড় বিস্ময়ের কথা যে, হোসেন শাহা তাঁহাকে সম্মানের সহিত আপন

পার্শ্বে আনিয়া উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন। দরবার শুদ্ধ লোক স্তম্ভিত!

"অতি মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান,
পরম গৌরবে বসিবারে দিলা স্থান।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

মুলুকের পতি বোকা ছিলেন না। হোসেন শাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই আসামী সাধারণ ব্যক্তি নহেন। ইহাঁর প্রতি কঠোর শাস্তিবিধান করিলে সহস্র সহস্র লোক সরকারের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু যদি মিষ্ট কথায় বলিয়া-কহিয়া তাঁহার মন ফিরান যায়, যদি তিনি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কলমা পড়িয়া পুনরায় পবিত্র যবন-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই সর্ব্বোত্তম হয়। প্রথমে সেই নীতিই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তাহাতে যদি তাঁহার মতিগতি না ফিরে, তবে শাস্তি দেওয়া ত নিজের হাতেই আছে। তাই তিনি ঠাকুর হরিদাসকে আপন বুদ্ধি অনুসারে বুঝাইয়া-শুঝাইয়া অনেক কথা বলিলেন।

"আপনে জিজ্ঞাসে তাঁরে মুলুকের পতি—
কেন ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি?
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন,
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন?
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত,
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশ-জাত।

জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার,
পরলোকে কেমনে বা পাইবে নিস্তার ?
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার,
সে পাপ ঘুচাহ করি কলমা উচ্চার।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

মায়া-মোহিত মুলুকপতির কথায় হাস্য করিয়া ঠাকুর হরিদাস বলিলেন—"অহো! বিষ্ণুমায়া!"

"শুনি মায়া-মোহিতের বাক্য হরিদাস,
অহো বিষ্ণুমায়া বলি হৈল মহা হাস।"

আমার
ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত বিরোধ! মতান্তরে এত ম
এক নিত্য সত্য অখণ্ড অব্যয় পুরুষ, স ...রণ পূর্ব্বক পুনরায়
করে, সেই একেরই আরাধনা করে। আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করা
সেই এক অব্যক্ত ...ের মান-সম্ভ্রম আর থাকিবে না।"
ভেদ। যাঁহার যেমন ...ন কথা বলিতেছিলেন, তখন হোসেন
অধিকার, সেই রুচি গিয়াছিল। প্রাণে একটু কোমলভাবও
বলেন, কেহ বা হ ...বার গোড়াই কাজীর উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে
এই কথাটা না বু ...তি অন্যদিকে ফিরিল। এবারে তিনি নরম-
ইত্যাকার সাম্প্রদা ...াইয়া, একটু শাসাইয়া বলিলেন—
ইহা ভাবিয়াই হা ...লে মুলুকের পতি—আরে ভাই,
বিষ্ণুমায়া!" অতঃ ...শাস্ত্র বল, তবে চিন্তা নাই।
ওজস্বিনী ভাষায় ...করিবে শাস্তি সব কাজীগণে,
উপবেশন করিলে ...ম, পাছে আর লঘু হবে কেনে?"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

"বলিতে লাগিল তারে মধুর উত্তর,
শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর।
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দু যবনে,
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে।
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়,
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়।
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন,
সেইমত কর্ম্ম করে সকল ভুবন।
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে,
বলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্রমতে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

সরকারের
কথায় বলিয়া-ক...
প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কলমা
করেন, তাহা হইলেই স...
অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তাহাতে যদি
ফিরে, তবে শাস্তি দেওয়া ত নিজের
তিনি ঠাকুর হরিদাসকে আপন বুদ্ধি অনুসা...
অনেক কথা বলিলেন।

"আপনে জিজ্ঞাসে তাঁরে মুলুকের প...
কেন ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন,
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন?
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত,
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশ-জাত।

...ষ্টই বলিলেন—"যিনি তোমার আমার
...সিয়া যেমন প্রেরণা
ইহাতে যদি আমার
...ার করিয়া আমাকে
...আছি।"
...র তারতম্য আছে।
উচ্চারণ করি, তখন
...কাথায় উড়িয়া যায়।
...র রসনায় উচ্চারিত
গুরুর গুরু হইয়া
...র করে। ঠাকুর

হরিদাস বলিয়াছিলেন কেবলমাত্র ঐ কয়েকটি সাধারণ সত্যকথা। কিন্তু তাঁহার কথায় শক্তি ছিল। তাঁহার কথা শুনিয়া যবনেরা মোহিত হইল। স্বয়ং মুলুকপতিও যেন একটু সন্তোষের ভাব ব্যক্ত করিলেন। ভাব-গতিক দেখিয়া আমাদের সেই গোড়াই কাজী মহাশয় বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন—এই বুঝি শীকার পলায়, বুঝি বা আসামী খালাস পায়। এ পাপী অব্যাহতি লাভ করিলে এই এক দুষ্টে কত জনকে দুষ্ট করিবে, পবিত্র যবন-কুলে কলঙ্ক আনয়ন করিবে। কাজী অতিশয় দৃঢ়তার সহিত মুলুকপতিকে বলিলেন—"বাদশানামদার! আমার নিবেদন এই যে, হয় এ ব্যক্তি কলমা উচ্চারণ পূর্ব্বক পুনরায় যবন-ধর্ম্মে প্রবেশ করুক, না হয়, ইহাকে আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করা হউক। তাহা না হইলে যবনের মান-সম্ভ্রম আর থাকিবে না।"

হরিদাস ঠাকুর যখন কথা বলিতেছিলেন, তখন হোসেন শাহার তাহা ভাল লাগিয়াছিল। প্রাণে একটু কোমলভাবও আসিয়াছিল। কিন্তু আবার গোড়াই কাজীর উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে বাদশাহের মনের গতি অন্যদিকে ফিরিল। এবারে তিনি নরম-গরম সুরে একটু সমজাইয়া, একটু শাসাইয়া বলিলেন—

"পুনঃ বলে মুলুকের পতি—আরে ভাই,
আপনার শাস্ত্র বল, তবে চিন্তা নাই।
অন্যথা, করিবে শাস্তি সব কাজীগণে,
বলিলাম, পাছে আর লঘু হবে কেনে?"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

যবন-রাজার চক্ষে ঠাকুর হরিদাসের অপরাধ অতি গুরুতর। তাহাতে আবার শাস্তি দিবেন কাজীর দল মিলিয়া। অর্থাৎ দরবারে উপস্থিত কাজীরা যে দণ্ড নির্দ্ধারিত করিবেন, তাহাই ঠাকুর হরিদাসকে ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং নিশ্চয়ই প্রাণ-দণ্ড অথবা তত্তুল্য কোনও একটা দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে, এই সহজ কথাটা হরিদাস ঠাকুর অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ভাবনা ভাবিয়া তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রাণের ভয়ে হরিনাম ছাড়িয়া কলমা পড়িতে হইবে—তোবা তোবা বলিতে হইবে, ইহা কি ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা সম্ভবে? প্রাণ ছাড়া যায়, কিন্তু হরিনাম ছাড়া যায় না, ইহাই হরিদাস ঠাকুরের প্রাণের কথা। মহাপুরুষদিগের চিত্ত এক দিকে যেমন কুসুম হইতেও সুকোমল, তদ্রূপ অন্যদিকে বজ্রাপেক্ষাও কঠোর। যাঁহারা ভাবেন যে, কৃষ্ণভক্ত হইলেই মানুষ ভীরু কাপুরুষ হয়, তাঁহাদিগকে আর কি বলিব, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত, বোধ হয়, তাঁহারা কৃষ্ণভক্ত দেখেন নাই। প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত একদিকে যেমন তৃণাদপি সুনীচ, তেমনই আবার অপরদিকে সাক্ষাৎ তেজের বিগ্রহ—জ্বলন্ত পাবক। ভক্ত প্রহ্লাদের কথা স্মরণ করুন। যিনি মহান্ হইতেও মহান্, গরীয়ান্ হইতেও গরীয়ান্, সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের অভয়পদে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার আবার ভয়?

সেই ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা নির্ভীক হরিদাস ঠাকুর মহাতেজের সহিত মুলুকপতির কথার উত্তরে বলিলেন—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই—যায় দেহ প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

বৈষ্ণবের তেজ দেখিয়া দরবার শুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইল। ঠাকুর হরিদাসের কণ্ঠ-নিঃসৃত সেই গম্ভীর ধ্বনি সর্ব্ব-চিত্ত চমকিত করিয়া তাহাদিগের কানে ও প্রাণে যাইয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

মুলুকপতির মুখের উপর এত বড় জোরের কথা আজ পর্য্যন্ত আর কেহ বলে নাই। বলা বাহুল্য যে, হোসেন শাহা হরিদাস ঠাকুরকে অতি কঠোর শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং কাজীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"এমন ব্যক্তিকে আপনারা এক্ষণে কি দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন?" কাজীগণের মুখপাত্র জবরদস্ত গোড়াই কাজী দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমাদের বিচারে এই কাফেরের উপযুক্ত দণ্ড এই হয় যে, এই ব্যক্তিকে একে একে বাইশটি বাজারে লইয়া গিয়া প্রত্যেক বাজারে সর্ব্ব-সমক্ষে মনের ঝাল মিটাইয়া ইহার কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বেত্রাঘাত করা এবং এই প্রকারেই ইহার পাপজীবনের অবসান করা। বাইশটি বাজারে প্রহার খাইয়াও যদি না মরে,

হাঁ, তবে বুঝিব যে, এ ব্যক্তি জ্ঞানী বটে, এ যাহা বলে, তাহা সত্য।”

মুলুকপতি কাজীর রায়েই রায় দিলেন, এবং যমদূতের মূর্ত্তিস্বরূপ পাইকদিগকে ডাকিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিয়া দিলেন,—“ইহাকে বাইশ বাজারে লইয়া গিয়া এমন প্রহার করিবে, যেন প্রহারে প্রহারেই ইহার প্রণাবায়ু বহির্গত হয়। যবন হইয়া যে ব্যক্তি হিন্দুয়ানি করে, এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুই তাহার প্রায়শ্চিত্ত।”

পাইকেরা পূর্ব্ব হইতেই উত্তেজিত হইয়া কেবল একটা হুকুমের অপেক্ষা করিতেছিল। হুকুম পাইবামাত্র, মনের আক্রোশ মিটাইয়া উহা তামিল করিবার নিমিত্ত উহারা ঠাকুর হরিদাসকে দৃঢ়রূপে রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া বাজারের দিকে লইয়া চলিল। ইহার পর যে লোমহর্ষণ পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হইতে লাগিল, সেই মর্ম্মবিদারিণী ব্যথার কাহিনী বর্ণন করিতে লেখনী অক্ষম।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

“বাজারে বাজারে সব বেড়ি দুষ্টগণে,
মারয়ে নির্জীব করি মহা ক্রোধমনে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করেন হরিদাস,
নামানন্দে দেহে দুঃখ না হয় প্রকাশ।
দেখি হরিদাস-দেহে অত্যন্ত প্রহার,
সুজন সকল দুঃখ ভাবেন অপার।

কেহ বলে অনিষ্ট হইবে সর্ব্বরাজ্য,
সে নিমিত্ত সুজনেরে করে হেন কার্য্য,
রাজা-উজীরেরে কেহ শাপে ক্রোধ-মনে,
মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে।
কেহ গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে,
কিছু দিব, অল্প করি মারহ উহারে।
তথাপিও দয়া নাহি জন্মে পাপিগণে,
বাজারে বাজারে মারে মহা ক্রোধমনে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ঠাকুর হরিদাসের প্রতি এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া শত-সহস্র লোক হায় হায় করিতে লাগিল, সকলের প্রাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাহারা যবনগণের পায়ে পড়িয়া কত কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল,—"তোমাদিগকে অর্থ দিব, তোমরা ঠাকুরকে কিছু কম করিয়া মার।" কিন্তু পাইকেরা আরও জোরে বেত চালাইতে লাগিল। কিন্তু যাঁহাকে এত করিয়া মারিতেছে, তাঁহার অবস্থা কি? তিনি এত প্রহারে কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছেন? আর কেমন করিয়াই বা এরূপ নির্ম্মম বেত্রাঘাত সহিতেছেন? প্রতি আঘাতে রক্ত ছুটিতেছে, আর সেই প্রতি শোণিতবিন্দু হরিদাস ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গের কনক-কান্তিতে উজলিয়া যেন হাসিয়া বলিতেছে—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

এত প্রহারেও ঠাকুর হরিনাম ছাড়েন নাই! ঐ দেখ, পাষণ্ডেরা কেমন করিয়া ঠাকুরকে মারিতেছে! আর দেখ, ঠাকুর এখনও কেমন প্রসন্ন-বদনে হরিনাম করিতেছেন! ঠাকুর হরিদাস কৃষ্ণের প্রসাদে নামানন্দে আপনার আত্মাকে যেন দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়াছেন, প্রাণে কোনও ক্লেশ নাই, দুঃখ নাই! কিন্তু একমাত্র দুঃখ, ইহাদের গতি কি হইবে?— হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো! ইহাদেরে কৃপা কর, ইহাদেরে কৃপা কর। ঠাকুর! ইহাদের অপরাধ লইও না—কেবল এই প্রার্থনা, এই আশীর্ব্বাদই ঠাকুর হরিদাসের প্রাণে জাগিতেছে!

"সবে যে সকল পাপিগণে তাঁরে মারে,
তার লাগি দুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে।
এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ,
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ।"

(শ্রী চৈঃ ভাঃ)

ক্রোধোন্মত্ত পাইকেরা হরিদাস ঠাকুরকে একে একে বাইশ বাজারে লইয়া প্রহার করিল, তথাপি তিনি মরিলেন না দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। এক্ষণে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—"এ কি মানুষের প্রাণ রে ভাই? এত মারণেও কি মানুষ বাঁচে? যদি মানুষ হইত, তবে দুই তিন বাজারের প্রহারেই মরিয়া যাইত। কি তাজ্জব! বাইশ বাজারে ঘুরাইয়া ইহাকে মারিলাম—যার যত শক্তি মারিলাম, তথাপি

দেখ, এখনও সে বাঁচিয়া আছে! এখনও সেই হরিনাম ছাড়ে নাই! বুঝি এই ব্যক্তি পীর হইবে।”

না, আরো দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।
পীর বা সবেই ভাবে মনে।”

(শ্রী চৈঃ ভাঃ)

সত্য : যবন পাইকদের বিশ্বাস জন্মিল যে, ইনি অতিমানব, ইহার মৃত্যু নাই। ইহাতে উহারা যেমন বিস্মিত, তেমনি ভীতও হইল। ভয়ের বিশেষ কারণ এই যে, হরিদাস ঠাকুরকে প্রাণে বধ করিতে না পারিলে কাজী সাহেব সকলেরই গর্দ্দান লইবেন। তাই প্রাণের ভয়ে—

“যবন সকল বলে—ওহে হরিদাস!
তোমা হৈতে আমা সবার হইবেক নাশ।
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার,
কাজী প্রাণ লইবেক আমা সবাকার।”

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকুর ঘাতকদিগের মুখের পানে প্রসন্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—“আমি না মরিলে যদি তোমাদের মন্দ হয়, তবে এই দেখ, আমি মরিতেছি।” ইহা বলিয়াই ঠাকুর শ্রীগোবিন্দের ধ্যানে আবিষ্ট হইয়া মহাসমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার দেহ নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া রহিল! পাইকেরা তাঁহাকে মৃতজ্ঞানে ধরাধরি করিয়া মুলুকপতির দ্বারে নিয়া ফেলিল।

"দেখিয়া যবনগণ বিস্ময় হইলা,
মুলুকপতির দ্বারে লইয়া ফেলিলা।'

(শ্রী চৈঃ ভাঃ)

সকল আপদ্ চুকিল। আর মড়ার উপর খাঁড়া দিয়া কি হইবে? ইহা ভাবিয়াই মুলুকপতি বলিলেন—"এখন আর কি, ইহাকে নিয়া গোর দাও।" কিন্তু গোড়াই কাজী তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, ইহাকে গোর দিলে ত ইহার সদ্গতি হইবে। এ ব্যক্তি বড় ঘরে জন্মিয়া যেমন নীচ কর্ম্ম করিয়াছে, পরকালেও ইহার তেমনিই দুর্গতি হওয়া উচিত। অতএব ইহাকে ধরিয়া গঙ্গার জলে নিয়া ফেলিয়া দিলেই ইহার উপযুক্ত সাজা হইবে।

কাজীর পরামর্শই অতি সুপরামর্শ বলিয়া বিবেচিত হইল। পাইকেরা হরিদাস ঠাকুরকে তুলিয়া নিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। ঠাকুর সর্ব্বশিবাস্পদ শবের ন্যায় সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন। যবনেরা বুঝিল না যে, ঠাকুর জীবিত। কারণ—

"কৃষ্ণানন্দসুখসিন্ধুমধ্যে হরিদাস,
মগ্ন হৈয়াছেন, বাহ্য নাহিক প্রকাশ।
কিবা অন্তরীক্ষে কিবা পৃথিবী গঙ্গায়,
না জানেন হরিদাস আছেন কোথায়।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ঠাকুর হরিদাস সুখদায়িনী ভাগীরথীর সুখ-শীতল সলিলে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিলেন, আর তীরে তীরে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। সর্ব্বসন্তাপহারিণী ঠাকুরের ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গে যেন তরঙ্গের ছলে আপন কোমল কর বুলাইয়া বুলাইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া দিলেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি তীরে উঠিলেন।

মৃত ব্যক্তির পুনর্জ্জীবনলাভ! ইহাতে সেই গঙ্গাতীর যে তখন কি প্রকার বিস্ময়-বিজড়িত আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সদানন্দময় পুরুষ হরিদাস ঠাকুর এত নির্য্যাতনের পরেও প্রফুল্লবদনে হরিনাম করিতেছেন এবং শত্রুর বদনপানেও প্রসন্ন-নয়নে চাহিতেছেন, এ দৃশ্য, এ দৃষ্টান্ত স্বর্গেও দুর্ল্লভ। সমবেত জনসঙ্ঘ মস্তক অবনত করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল এবং গম্ভীর উচ্ছ্বাসে মনের আনন্দে সহস্র সহস্র কণ্ঠে হরিধ্বনি করিয়া গঙ্গার এ কূল ওকূল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। যবনগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া চিত্তে স্তম্ভিত হইল এবং পীরজ্ঞানে ঠাকুরের চরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল।

"পীর জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার,
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

মুলুকের পতি এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার কথা শুনিয়া অবিলম্বে সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া বালকের ন্যায় হাসিতে লাগিলেন। তখন—

"সম্ভ্রমে মুলুকপতি যুড়ি দুই কর,
বলিতে লাগিলা কিছু বিনয়-উত্তর,
—সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহাপীর,
এক জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির।
তোমারে দেখিতে মুঞি আইনু হেথারে,
সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে।
সকল তোমার সম, শত্রু মিত্র নাই,
তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাই।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ঠাকুর হরিদাস যবনরাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ফুলিয়ায় চলিয়া আসিলেন।

"যবনেরে কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রকাশ,
ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর হরিদাস।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

পুনরায় ফুলিয়ায়।

ফুলিয়া হইতে হরিদাস ঠাকুরকে ধরিয়া লইয়া যাইবার পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার সমস্ত বৃত্তান্তই ফুলিয়ায় আসিয়া পোঁছিয়াছে। অদ্য বহু লোকে আসিয়া সংবাদ দিল যে,

হরিদাস ঠাকুর পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া ফুলিয়ায় ফিরিয়া আসিতেছেন—এই আসিলেন বলিয়া। সে কথা মুহূর্ত্তের মধ্যে মুখে মুখে সমস্ত ফুলিয়ায় রটিয়া গেল। ফুলিয়ার স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, সকলেই ঠাকুরকে দেখিবার নিমিত্ত গ্রামের বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার আগমন-পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চাহিয়া রহিল। ফুলিয়া-সমাজের মধ্যে এত দিন যাঁহারা হরিদাস ঠাকুরকে তেমন ভাল চক্ষে দেখিতে পারেন নাই, সদ্য অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেই খাঁটী সোনাকে দেখিবাব নিমিত্ত, আজ তাঁহারাও প্রাণে শ্রদ্ধা লইয়া আসিয়াছেন!

ঐ যে! ঐ যে তিনি আসিতেছেন—ভাবে ডগমগ হইয়া তেমনিভাবে হরিনাম করিতে করিতে আসিতেছেন! দেখিতে দেখিতে আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইলেন।

"উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে,
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ-সভাতে।
হরিদাসে দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ,
সবেই হইলা অতি পরানন্দ মন।
হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে,
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে।
স্থির হই ক্ষণেকে বসিলা হরিদাস,
বিপ্রগণ বসিলেন বেড়ি চারি পাশ।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া

স্থিরাসনে বসিয়া মৃদু-মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন—“বিপ্রগণ! আপনারা আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখ করিবেন না। আমি সত্য সত্যই অপরাধী। এই পাপ কর্ণে কত কৃষ্ণনিন্দা শুনিয়াছি। সেই পাপেই আমার এই শাস্তি হইয়া গেল। ঈশ্বরের কৃপায় অল্প শাস্তিতেই আমার গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত হইল, ইহা আমার পরম সুখেরই কথা।”

“প্রভু-নিন্দা আমি যে শুনিল অপার,
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার।
ভাল হৈল ইথে বড় পাইনু সন্তোষ,
অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন বড় দোষ।”

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

যবন পাইকগণ যখন হরিদাস ঠাকুরকে বন্দী করিয়া লইতে ফুলিয়ায় আসিয়াছিল, সেই সময়ে তাহারা ঠাকুরের ভজন-কুটীরখানি ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া ভূমিসাৎ করিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ফুলিয়ার লোকেরা তাঁহার ভজনেব নিমিত্ত গঙ্গা-পুলিনে একটি সুন্দর গোফা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। হরিদাস ঠাকুর কখন কখন বিপ্রগণসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে ও অবশিষ্ট কাল সেই নির্জ্জন গোফামধ্যে ভজনানন্দে কর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

হরিদাস ঠাকুরের ভজন-স্থান ফুলিয়ার সেই গোফার চিহ্ন অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। দেশবিদেশের ভক্তগণ তথাকার ধূলি মস্তকে লইয়া অদ্যাবধি হরিদাস ঠাকুরের নামে জয়ধ্বনি করিয়া থাকেন। ফুলিয়া, রাণাঘাট ও শান্তিপুরের মধ্যবর্ত্তী যে,

হরিদাস ঠাকুরের পাট—ফুলিয়া।
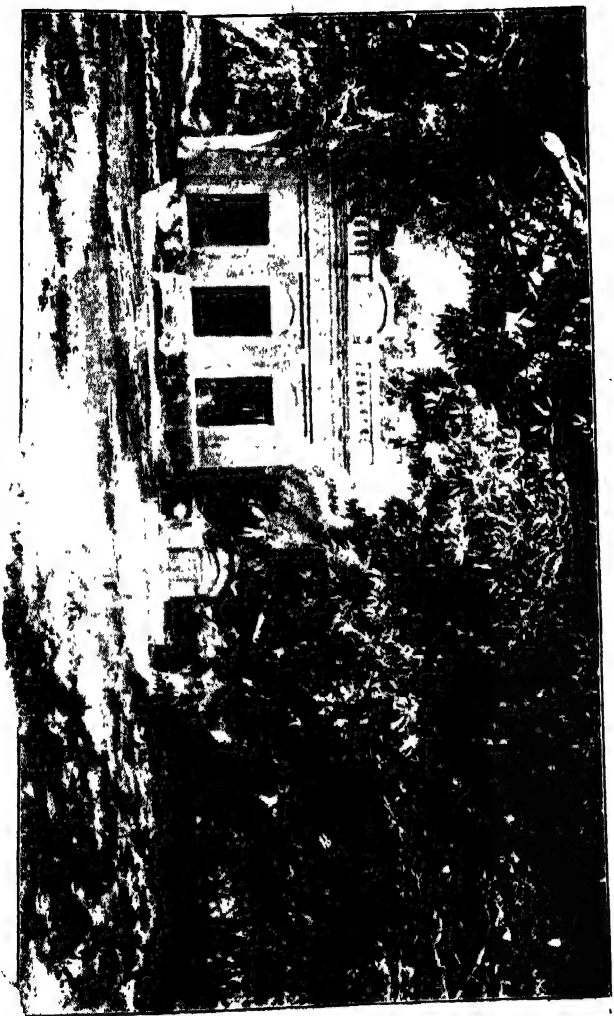
অবস্থিত। ফুলিয়ার ন্যায় কুলীনগ্রামেও ঠাকুর হরিদাসের পাট (ভজন-স্থান) আছে। সে স্থানে প্রতি বৎসর অনন্ত-চতুর্দ্দশীতে মহোৎসব হইয়া থাকে। কিন্তু হরিদাস ঠাকুর যে কোন্ সময়ে কুলীনগ্রামে গিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ গ্রন্থপত্রে পাওয়া যায় না। কুলীনগ্রাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত।

এখন হইতে হরিদাস ঠাকুরের গোফার দ্বারে অতিমাত্র লোকের ভিড় হইতে লাগিল। অপরাহ্ন হইলেই সকলে আসিয়া তথায় উপস্থিত হন। শতশত ব্রাহ্মণ-সজ্জন তথায় বসিয়া নামকীর্ত্তন শুনেন, পরে গঙ্গায় সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু কিছু দিন যাবৎ সে স্থানে সকলেই একটা অসহ্য জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। লোকেরা আসিয়া বসেন, কিন্তু বেশীক্ষণ তথায় তিষ্ঠিতে পারেন না; ঠাকুরের কিন্তু কোনও উদ্বেগ নাই। ব্রাহ্মণেরা এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত বৈদ্য অর্থাৎ সাপের রোজাগণকে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা নানা গুণ-জ্ঞান করিয়া বলিল যে, গোফার ভিতরে সুড়ঙ্গমধ্যে এক মহানাগ বাস করেন। তাঁহারই বিষের জ্বালায় বাহিরেও এত জ্বালা।

ব্রাহ্মণগণ শশব্যস্তে হরিদাস ঠাকুরের নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং তাঁহাকে তখনই গোফা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে অনুরোধ করিলেন। হরিদাস ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! আমি এত দিন এ স্থানে আছি, কিন্তু এক দিনের তরেও ত কোনও জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করি নাই! তবে আপনারা

নাকি অসহ্য জ্বালায় ক্লেশ পাইতেছেন, এজন্য আপনাদের অনুরোধে আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু অদ্য নহে, কল্য। এক্ষণে আমার একটি অনুরোধ যে, আপনারা সকলে মিলিয়া একবার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গান করুন। তাহাতে হয় ত এই জ্বালা দূর হইতে পারে।”

তখন সকলে মিলিয়া হরিদাস ঠাকুরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া হরিনাম-কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, দেখিতে দেখিতে এক মহাকায় সর্প গোফার দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে নির্ভয়ে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

“এইমত কৃষ্ণকথা মঙ্গল কীর্ত্তনে,
থাকিতে অদ্ভুত অতি হৈল সেইক্ষণে।
হরিদাস ছাড়িবেন শুনিয়া বচন,
মহানাগ স্থান ছাড়িলেন সেইক্ষণ।
মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক-উপরে,
দেখি ভয়ে বিপ্রগণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরে।”

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ইহা অসম্ভব ঘটনা নহে। ফলতঃ আজকালকার দিনেও এই প্রকার ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতকুলপ্রদীপ সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু যখন ঢাকানগরীর উপকণ্ঠস্থ গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে বাস করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার ক্ষুদ্র ভজন-কুটীরে একটি বিষধর সর্প বাস করিত। গোস্বামী প্রভু তাহাকে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে দুধ-কলা দিতেন। সময় সময়

সেই সর্প গর্ত্ত হইতে উঠিয়া কুটীর-মধ্যে বিচরণ করিত, এবং কখনও গোসাঞিঁর ক্রোড়দেশে, কখনও বা তাঁহার জটা বাহিয়া স্কন্ধে ও মস্তকের উপরে যাইয়া উঠিত। গোসাঞিঁ তখন চুপ্‌টি করিয়া রহিতেন। এই অদ্ভুত ঘটনা বহু লোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নবদ্বীপেও এক টোল ছিল। অধুনা তিনি তথায় একটি ভক্তি-সভারও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রতিদিন গীতা-ভাগবত পাঠ ও হরি-সংকীর্ত্তনে অদ্বৈতভবন মুখরিত হইতেছে। তখন নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ছিল। বৃদ্ধ আচার্য্য কয়েকজনমাত্র ভক্ত লইয়া অদম্য উৎসাহের সহিত এই সভায় ভক্তির চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীনিবাস আচার্য্য (শ্রীবাস নামে পরিচিত) ও তাঁহার তিন ভ্রাতা শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি আর মুরারি গুপ্ত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, চট্টগ্রামনিবাসী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও বাসুদেব দত্ত এবং শ্রীমান্, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস ও শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত নিয়মিতরূপে অদ্বৈত-সভায় আসিতেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রাতে কি সন্ধ্যায় হাতে তালি দিয়া সংকীর্ত্তন করিতেন। এজন্য সমস্ত নবদ্বীপ তাঁহাদিগের উপর খড়গহস্ত ছিল। হরিদাস ঠাকুর প্রাণে প্রাণে নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের প্রাণের সাড়া পাইয়াই যেন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ফুলিয়ার ব্রাহ্মণগণের নিকট বিদায় লইয়া তিনি নবদ্বীপে চলিয়া আসিলেন।

"বিষয়েতে মগ্ন জগৎ দেখি হরিদাস,
দুঃখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ছাড়েন নিঃশ্বাস।
কত দিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি,
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপপুরী।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপে

হরিদাস ঠাকুর যখন নবদ্বীপে আগমন করেন, সেই সময়ে নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ কি ভাবে কাল কাটাইতেছিলেন, পূর্ব্বাধ্যায়ে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই সময়ে নবদ্বীপ জ্ঞানের চর্চ্চায় ভারতে অদ্বিতীয় স্থান ছিল। শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে দেশবিদেশ হইতে পড়ুয়া আসিয়া নবদ্বীপে বাস করিত। তখনকার নবদ্বীপ পণ্ডিতের নবদ্বীপ। জ্ঞানের চর্চ্চা বিলক্ষণ হইত। ভক্তির চর্চ্চা ও ভক্তির সাধনাকে পণ্ডিতেরা ভাবুকতার ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বদা উপেক্ষা ও উপহাস করিতেন। তাঁহারা কেহ কেহ গীতা-ভাগবতও পড়াইতেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভক্তির কথা না বলিয়া জ্ঞানের ব্যাখ্যাই করিতেন। সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মের নিয়ম পালন করিত কেবল অক্ষরে, কিন্তু ভাব রক্ষা করিতে পারিত না। জাত্যভিমান ও পাণ্ডিত্যাভিমান সমাজে অত্যন্ত প্রবল ছিল।

তৎকালে নবদ্বীপে ভক্তির ধর্ম্ম প্রায় ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতি বড় সুকৃতী যিনি, তিনি হয় ত স্নানের সময় দুই একবার গোবিন্দ কি পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারণ করিতেন, এই পর্য্যন্তই। শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে মিলিয়া যে কয়েকটি বৈষ্ণব নিষ্ঠার সহিত ভক্তিধর্ম্মাচরণ করিতেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা লাঞ্ছিত হইতে হইত। 'সোঽহং' ভাবটা তখন প্রায় সকল লোকের মধ্যেই, প্রাণে নহে, কিন্তু বচনে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাঁহারা বলিতেন, "ব্রহ্ম ত ঘটে পটে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। আমিই ব্রহ্ম। সুতরাং ডাকিব কাহাকে? এই মূর্খগুলা বৃথা হরি হরি বলিয়া চীৎকার করে কি জন্য? ইহারা সমাজের উপদ্রববিশেষ। ইহাদিগের ঘর-দরজা ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলে তবে এদের উপযুক্ত শাস্তি হয়।"

"বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ নাম,
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান।
অতি বড় সুকৃতী সে স্নানের সময়,
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়।
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়,
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়।
হাতে তালি দিয়া যে সকল ভক্তগণ,
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন।
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে,
ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে?

আমি ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন,
দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ ?
এগুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া,
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া।
শুনিয়া পায়েন দুঃখ সর্ব্বভক্তগণ,
সম্ভাষ করেন হেন নাহি কোন জন।”

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

দেশমধ্যে যখন ভক্তির এরূপ দারুণ দুর্ভিক্ষ, সমস্ত সমাজ যখন তুচ্ছ বিষয়-রসে উন্মত্ত, যখন বিষ্ণুভক্তগণ চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিয়া ‘হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ’ বলিয়া হাহাকার করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভক্তির বিগ্রহস্বরূপ হরিদাস ঠাকুর আসিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এ দুর্দ্দিনে তাঁহার ন্যায় একজন ভক্তিমান্, শক্তিমান্, সমধর্ম্মী ও ব্যথার ব্যথী পাইয়া ভক্তগণ প্রাণে আশ্বস্ত হইলেন, শ্রীঅদ্বৈত উচ্ছ্বসিত আনন্দের আবেগে হুঙ্কার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

“শূন্য দেখি ভক্তগণ সকল সংসার,
হা কৃষ্ণ বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার।
হেন কালে তথায় আইলা হরিদাস,
শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তি যাঁর বিগ্রহ প্রকাশ।
পাইয়া তাঁহার সঙ্গ আচার্য্য গোসাঞি,
হুঙ্কার করেন আনন্দের অন্ত নাই।”

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকুরের আগমনের পর হইতে নব উদ্যমে ভক্তি-সভার কার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে বিরোধিগণের উপদ্রব কিছুমাত্র কমিল না, বরং বাড়িয়া চলিল। ভক্তবৃন্দ অতিমাত্র দুঃখিতান্তঃকরণে জগতের কল্যাণ-কামনায় দিবানিশি ভূভারহারী ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন এবং আশাবদ্ধ সমুৎ-কণ্ঠার সহিত তাঁহার অবতরণের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

"স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ,
কৃষ্ণ-পূজা গঙ্গা-স্নান কৃষ্ণের কথন।
সবে মেলি জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ,
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সবারে প্রসাদ।"

এই সময়ে হরিদাস ঠাকুরের বয়স আনুমানিক চৌত্রিশ বৎসর এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বয়ঃক্রম একান্ন বৎসর হইবে। আচার্য্যের এক জ্ঞান, এক ধ্যান—কত দিনে কৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া জীবের দুঃখ দূর করিবেন। সেই 'জ্ঞানভক্তি-বৈরাগ্যের মুখ্য গুরু' শ্রীঅদ্বৈত ভক্তগণ-সঙ্গে নিরবধি কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-ভক্তির ব্যাখ্যান করিতেছেন, আর, 'তুলসীমঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে' শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনা করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আবেশে ঘন ঘন হুঙ্কার করিতেছেন।

"তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে,
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতূহলে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে,
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ইহার প্রায় এক বৎসর কাল পরে চৌদ্দশত সাত শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সিংহরাশি সিংহলগ্নে সায়ংকালে চন্দ্র-গ্রহণের সময় শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হয়েন। গ্রহণোপ-লক্ষে সমস্ত নদীয়ার লোক গঙ্গাস্নানে যাইতে লাগিলেন। দেশ-বিদেশ হইতেও কত লোক এই শুভক্ষণে শুভযোগে গঙ্গাস্নান করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে আসিয়াছেন। সহস্র সহস্র লোক স্নান করিতেছেন, দান করিতেছেন ও গ্রহণ দর্শন করিতেছেন—সকলেই মনের উল্লাসে হরিধ্বনি করিতেছেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরের ধ্বনির সহিত লক্ষ কণ্ঠের হরিধ্বনি মিলিয়া তৎকালে নবদ্বীপে যেন গোলোকের আনন্দ-বৈভব ব্যক্ত করিতেছিল। এই পরম শুভ মুহূর্ত্তে কোটি চন্দ্রের কান্তি ম্লান করিয়া কাঞ্চন-গৌর গৌরচন্দ্র প্রকাশিত হইয়া শচীমায়ের কোলে হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে দশদিক্ প্রসন্ন হইল, স্থাবরজঙ্গম আনন্দ-শ্রী ধারণ করিল।

"প্রসন্ন হৈল দশদিক্ প্রসন্ন নদীজল,
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল।"

"সেই কালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে,
হরিদাস লৈয়া সঙ্গে হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে।
জগৎ আনন্দময় দেখি মনে সবিস্ময়
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস,

তোমার ঐছন রঙ্গ মোর মন পরসন্ন
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস।"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর পনর ষোল বৎসর পর্য্যন্ত হরিদাস ঠাকুরের জীবনের বিশেষ কোনও ঘটনার উল্লেখ গ্রন্থপত্রে দৃষ্ট হয় না। এতাবৎকাল তিনি শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস আচার্য্য প্রভৃতির সঙ্গে কৃষ্ণকথায়, কৃষ্ণকীর্ত্তনে ও নামজপব্রত-উদ্‌যাপনে অতিবাহিত করিতেছিলেন, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। তিনি মাঝে মাঝে শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে গিয়াও থাকিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কিশোর-যৌবনে অধ্যাপনা শেষ করিয়া সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের মাঝে স্বীয় উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজিত; যখন শ্রীঅদ্বৈত স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি এত ব্রত-উপবাস করিয়া গঙ্গাজল-তুলসী দ্বারা যাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, যাঁহার নামে হুঙ্কার করিয়াছিলেন, ইনিই তাঁহার সেই প্রাণের ঠাকুর; যখন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় হরিসংকীর্ত্তনের মাঝে সেই কনক-পুতলিয়া শচীদুলালের ভুবনমোহন নর্ত্তন ও ভাবাবেশ দেখিয়া ভক্তবৃন্দ দেহ-গেহ ভুলিয়া অহর্নিশি গৌর-প্রেমে উন্মত্ত; যখন ভায়ার প্রেমে মাতোয়ারা অবধূত নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া গৌরপ্রেমের উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়াছেন; যখন গৌরপ্রেমে "শান্তিপুর ডুবু-ডুবু, নদে ভেসে যায়"; সেই সময় হইতে আবার নানা ভাবের মধ্যে হরিদাস ঠাকুরের ভক্তিবিলসিত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি আমাদের নয়নগোচর হয়।

একদিন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় সপ্তপ্রহরব্যাপী মহাসংকীর্ত্তনে শ্রীগৌরাঙ্গ সকল ভক্ত লইয়া মহাভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং সেই ভাবের আবেশেই এক এক করিয়া সকলকে নিকটে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন—"হরিদাস! তুমি আমার দেহ হইতেও অধিক প্রিয়। তোমাকে নিষ্ঠুরেরা যে বাজারে বাজারে প্রহার করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই আঘাত এখনও আমার অঙ্গে বাজিতেছে। ধন্য তুমি! যাহারা এত লাঞ্ছনা দিয়া তোমাকে মারিল, তুমি তাহাদের কল্যাণকামনা করিয়াছিলে!"

"পাপিষ্ঠ যবনে তোমা দিল বড় দুঃখ,
তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক।
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারয়ে সকলে,
তুমি মনে চিন্ত তাহে সবার কুশলে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর বহু স্তব-স্তুতি করিয়া একান্ত দৈন্যসহকারে বলিলেন—"শ্রীশচীনন্দন! আমি তোমার চিরদাস। আমাকে এই কৃপা কর, আমি যেন তোমার ভক্তের দুয়ারে কুক্কুর হইয়া থাকিতে পারি। যাঁহারা তোমার সেবক, আমি যেন তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট পাইয়া কৃতার্থ হই।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন—

"তোমাকে যে করে শ্রদ্ধা আমাকে সে করে,
নিরবধি আছ আমি তোমার শরীরে।
তুমি হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল,
তুমি আমা হৃদয়ে বান্ধিলা সর্ব্বকাল।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জগাই-মাধাই।

এ স্থলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। রাঢ়দেশে একচক্র নামক এক গ্রামে দ্বাপরযুগে পঞ্চপাণ্ডব একবৎসরকাল অজ্ঞাত বনবাসে ছিলেন। উহার বর্ত্তমান নাম একচাকা। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে এই একচাকা গ্রামে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রাঢ়ীয় শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকুলে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাড়াই ওঝা, মাতার নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দের বাল্যকালেই পিতা-মাতা তাঁহাকে এক পরিব্রাজক সাধুর হস্তে সমর্পণ করেন। নিত্যানন্দচন্দ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের প্রায় সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার প্রথম যৌবনে নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত

মিলিত হয়েন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে, যিনি যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই এই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ, আর যিনি রোহিণীনন্দন শ্রীবলদেব, তিনিই এই যুগে পদ্মাবতীকুমার শ্রীমন্নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণুর অবতার।

"তের শত পঁচানব্বই শকে মাঘমাসে,
শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে।
ব্রজে বলরাম যেঁই সেঁই নিত্যানন্দ,
অবতীর্ণ হৈলা বিতরিতে প্রেমানন্দ।"

(শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ)

নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে আগমনের পর হইতে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত প্রতিদিন জমাট হরিসংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায়, এমন কি নিশীথ-কালে, পর্য্যন্ত গৌর-নিতাই ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর থাকিতেন। এই সময়ে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাসঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন—

"শুন শ্রীপাদ! শুন হরিদাস! তোমাদিগের উপর আমি একটি বিশেষ কার্য্যের ভার অর্পণ করিতেছি। অদ্য হইতে তোমরা দুই জনে এই নবদ্বীপের ঘরে ঘরে যাইয়া সকলকে হরিনাম লওয়াইবে। দেখ, শ্রীকৃষ্ণবিমুখ হইয়া জীব কত দুঃখ পাইতেছে। তোমরা যাহাকে দেখিবে, অবিচারে তাহাকেই কৃষ্ণনাম শুনাইবে ও শ্রীকৃষ্ণভজন উপদেশ করিবে। ইহা

ভিন্ন আর কোনও কথা বলিবে না, বলাইবেও না। দিবাশেষে আসিয়া তোমাদের প্রচারের বৃত্তান্ত আমাকে জানাইবে।”

শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পাইয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস হরিনাম প্রচার করিতে নগরে বাহির হইলেন। গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা নিত্যানন্দ একেই ত অষ্টপ্রহর ভাবে ডগমগ, তাহাতে আবার গৌরাঙ্গের আদেশ। ঐ দেখ, প্রেমে মত্ত নিতাইচাঁদ মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় কেমন হেলিয়া দুলিয়া নদীয়ার রাজপথ দিয়া যাইতেছেন। নিত্যানন্দের অবধূত-বেশ, সুবলিত গঠন, উন্নত দেহ, চিক্কণ শ্যামবর্ণ। নিতাইচাঁদ নদীয়ার বাজার আলো করিয়া যাইতেছেন। জীবের দুঃখে নিরন্তর অন্তর দহিতেছে, তাই বুঝি কমলদলের ন্যায় বিস্তৃত রাতুল যুগলনেত্র করুণায় ছল-ছল করিতেছে। নিতাই আগে আগে যাইতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে, নাম-রসে ভরপূর হইয়া, হরিদাস ঠাকুর যাইতেছেন। নিত্যানন্দ নবীন যুবক, হরিদাস প্রবীণ বৃদ্ধ। নিত্যানন্দ বাল্যভাবে সদাই চঞ্চল, হরিদাস স্থির-গম্ভীর। উভয়েরই সাধুর বেশ। তাঁহারা নদীয়ার ঘরে ঘরে যাইয়া বলিতে লাগিলেন—

“বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে।”

আরও বলিলেন—

“কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন,
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই একমন।”

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

উভয়ের সাধুর বেশ দেখিয়া, যাঁহারা একটু ভাল লোক, তাঁহারা তাঁহাদিগকে ভিক্ষার জন্য সনির্ব্বন্ধে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিতাই-হরিদাস বলিলেন, "ভাই, আমরা অন্য কিছুর প্রার্থী নহি, এইমাত্র ভিক্ষা চাই যে, তোমরা বদন ভরিয়া কৃষ্ণনাম লও, আর কৃষ্ণের ভজনা কর।" তাহা শুনিয়া কেহ বলিলেন, "আচ্ছা, ভাল কথাই ত, তা করিব।" অপর কেহ কেহ বলিলেন, "এই দুইজন বলে কি? বুঝি বা ইহারা মন্ত্রদোষে পাগল হইয়াছে। নিমাই পণ্ডিতের মাথা খারাপ হইয়াছে, সে-ই সকলকে নষ্ট করিতেছে। কত ভব্যসব্য লোক নিমাইয়ের সঙ্গে মিশিয়া একবারে উচ্ছন্ন গিয়াছে!" আবার কেহ কেহ বলিলেন, "এ দুই বেটা নিশ্চয় চোর। দিনের বেলা সাধু সাজিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষার ছলে বেড়ায়, আর রাত্রে আসিয়া সিঁদ কাটে। ইহাদিগকে দেয়ানে ধরাইয়া দিলে আক্কেল হয়।" নিত্যানন্দ ও হরিদাস সকলের উক্তি শুনিয়া হাসেন, আর বলেন—প্রভু ভাল হরিনাম লওয়াইতে পাঠাইয়াছেন! এইরূপে পরম কৌতুকে দুই জনে নদীয়ার ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়ান এবং সন্ধ্যার সময় আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট দিবসের প্রচার-বৃত্তান্ত নিবেদন করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুর একদিন প্রচারে বাহির হইয়া দেখিলেন, পথের মধ্যে দুই প্রকাণ্ড মাতাল আস্ফালন পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে। তাহারা ক্ষিপ্ত মহিষের ন্যায় ছুটিয়া পথের লোকদিগকে তাড়া করিতেছে, গালি পাড়িতেছে, আবার

কখনও বা নিজেরাই দু'জনে কিলাকিলি চুলাচুলি করিয়া মাটীতে পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে। তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়াই লোকেরা প্রাণের দায়ে ছুটিয়া পলাইতেছে।

"দুই জন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়,
যাহারেই পায় সেই তাহারে কিলায়।
ক্ষণে দুই জনে প্রীত ক্ষণে ধরে চুলে,
চকার বকার শব্দ উচ্চ করি বলে।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

নিত্যানন্দ করুণার্দ্র-হৃদয়ে পথের লোকদিগকে এই দুই জনের নাম, ধাম ও জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, "কি বলিব গোসাঞি! এই নবদ্বীপেই ইহাদিগের বাস। দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠের নাম মাধব, আর কনিষ্ঠের নাম জগন্নাথ। অতি উচ্চ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্ম। বাল্য-কালেই কুসঙ্গে পড়িয়া সুরাপানাসক্ত হয়। আর এখন ত এই অবস্থা। ইহারা না করিয়াছে, এমন পাপ নাই। চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান, পরের ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া, নরহত্যা, ব্যভিচার ও গোমাংসভক্ষণ, এ সমস্ত ইহাদিগের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম।"

"সে দুই জনার কথা কহিতে অপার,
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর।
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস ভক্ষণ,
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ।"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ বিলক্ষণ জানিতেন যে, দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে হরিনাম প্রচার করা যার তার কর্ম্ম নয়। এ কার্য্যের জন্য, জীবের দুঃখে কাতব মহাপ্রাণ শক্তিমান্ ব্যক্তির প্রয়োজন। এ নিমিত্ত তিনি মহাশক্তিধর করুণার সাগর নিতাইচাঁদকে জীবের কাণে নাম শুনাইতে পাঠাইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে দিলেন বারংবার অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আমাদের হরিদাস ঠাকুবকে। জগাই-মাধাইয়েব দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া ও স্বচক্ষে কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ করিয়া নিত্যানন্দের দয়ার প্রাণ একান্ত বিচলিত হইল। তিনি করুণা-কাতর অন্তরে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই দুই জনকে উদ্ধার করিতেই হইবে। আহা! ইহারা মদের নেশায় এখন যেমন আত্মহারা, যে দিন শ্রীকৃষ্ণের নামে তেমনি ধারা হইবে, আর যে দিন আমার প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের নামে কাঁদিয়া সারা হইবে, সেই দিন জানিব যে, আমার সমস্ত পর্য্যটন সার্থক হইল। যাহারা ইহাদের ছায়া স্পর্শ করিলে সদ্যঃ যাইয়া গঙ্গাস্নান করে, তাহারা যদি এই দুই জনকে দেখিয়া গঙ্গাস্নানতুল্য জ্ঞান না করে, তবে আমি নিত্যানন্দ নাম বৃথাই ধারণ করি।"

নিত্যানন্দ মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রকাশ্যে হরিদাসঠাকুরকে কহিলেন—"দেখ হরিদাস! ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া ইহাদের কি দুর্গতি! যদি তোমার কৃপা হয়, তবেই এই দুইটি জীব উদ্ধার পায়। যবনেরা তোমাকে প্রাণান্ত করিয়া প্রহার করিল, তথাপি তুমি তাহাদিগের কুশলকামনাই

করিয়াছিলে। তুমি যদি ইহাদের একটু শুভানুসন্ধান কর, তবেই ইহারা তরিয়া যায়।"

"প্রাণান্তে মারল তোমা যবনের গণে,
তাহারও করিলে তুমি ভাল মনে মনে।
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে,
তবে সে উদ্ধাব পায় এই ছুই জনে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাসঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুকে ভালরূপেই জানিতেন। এ সকল কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে, এই দুই জনের উদ্ধার হইতে আর বিলম্ব নাই। তাই বলিলেন—"শ্রীপাদ! তুমি আমাকে মিছা ছলনা করিতেছ কেন? স্বয়ং তুমি যাহাদের উদ্ধার চিন্তা কর, তাহারা ত উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। আর, আমার জানিতে বাকী নাই যে, তোমার যে ইচ্ছা, মহাপ্রভুরও সেই ইচ্ছা।"

তখন নিত্যানন্দ হাস্যপূর্ব্বক হরিদাসঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, যাক্ সে কথা। তবে এস, দুই জনে উহাদিগের কাছে যাইয়া কৃষ্ণনাম শুনাই। প্রভুব আজ্ঞা এই যে, অবিচারে সকলকে কৃষ্ণনাম বিলাইতে হইবে, বিশেষতঃ পাপিতাপীকে। আমাদিগের উপর শুধু বলিবার ভার, আমরা বলিয়াই মুক্ত। যদি উহারা আমাদের কথায় কৃষ্ণ না বলে, কৃষ্ণ না ভজে, তবে সে কথা প্রভু বুঝিবেন।"

"সবারে ভজিতে কৃষ্ণ প্রভুর আদেশ,
তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ।
বলিবার ভার মাত্র আমা দোঁহাকার,
বলিলে না লয় যবে সেই ভার তাঁর।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

অতঃপর দুই জনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে জগাই-মাধাইয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু রাস্তার লোকেরা তাঁহাদিগকে সে দিকে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিল—"তোমরা বিদেশী সাধু, ইহাদিগকে চিন না। ইহারা ঠাকুর, দেবতা, সাধু, সজ্জন, কিছুই মানে না। তোমরা সাধু বলিয়া যে উহারা তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে, তাহা মনেও করিও না; জগাই-মাধাই তেমন পাত্রই নয়। তোমরা উহাদের নিকট যাইও না, বিপদে পড়িবে।" তাহারা হিত-কথাই বলিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু মহাপ্রভুর আজ্ঞা যে, অবিচারে সকলকে কৃষ্ণনাম শুনাইতে হইবে। সুতরাং দুই সাধু যাইতে যাইতে জগাই-মাধাইয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—

"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লও কৃষ্ণ নাম,
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

জগাই-মাধাই নেশার ঝোঁকে অন্যমনস্ক থাকাতে এতক্ষণ নিত্যানন্দ-হরিদাসকে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের

মুখের ঐ সকল শব্দ শুনিবামাত্র মাথা তুলিয়া সম্মুখের দিকে চাহিতেই দেখে যে, দুই জন সন্ন্যাসী বড় গলায় কৃষ্ণনাম লইতেছে। আর কি রক্ষা আছে? রাঙ্গা কাপড় দেখিলে যেমন মহিষ ক্ষেপে, সেইরূপ দুই যণ্ডামার্ক ক্ষেপিয়া ধর্ ধর্ বলিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে এমনি তাড়া করিয়া আসিল যে, তাঁহারা ভয়ে দৌড়াইয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন। উভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতেছেন, জগাই-মাধাইও তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। এই ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারিতেছে না। সেই দুই জনের কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! রক্ত-জবার মতন চক্ষু, আর অসুরের ন্যায় প্রকাণ্ড দেহ, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত ও ধূলিধূসরিত। ভাগ্যে দুই জনই স্থূলকায়, দ্রুত দৌড়াইতে অক্ষম, বিশেষতঃ সুরার প্রভাবে টলটলায়মান, তাই রক্ষা। নিত্যানন্দ ও হরিদাস ছুটিতেছেন আর এক একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন। হরিদাস নিতাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতেছেন, "আর ত আমি চলিতে পারিতেছি না। সেবারে যবনের হস্ত হইতে কোনও প্রকারে প্রাণটা লইয়া ফিরিতে পারিয়াছিলাম। আজ এই চঞ্চলের বুদ্ধিতে আসিয়া বুঝি বা তাহা হারাইলাম।"

নিতাই বলিলেন—"বেশ, বিলক্ষণ! আমি হইলাম চঞ্চল! তোমার প্রভুটির দোষ তুমি কিছুই দেখ না। হুঁ, ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজার ন্যায় আদেশ জারি করেন। তাঁর আজ্ঞা না শুনিলেও দোষ, আর উহা পালন করিতে গেলে ত এই

লাভ! তার পর লোকে চোর, ঢঙ্ ছাড়া বলে না। তুমি ত বেশ আমাকে দূষিতেছ। দুই জনে গিয়া উহাদের কাছে প্রভুর আজ্ঞা বলিলাম, আর দোষী হইলাম একলা আমি”?

“আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি,
দুই জনে বলিলাম, দোষভাগী আমি?”

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

উভয়ে পরম কৌতুকে এইরূপ প্রেমকোন্দল করিতে করিতে চলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বাটীর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতেই দেখেন যে, দস্যুদ্বয় বহুদূরে রহিয়াছে এবং তাঁহাদিগের লাগ না পাইয়া এখন নিজেরাই হুড়া-হুড়ি করিতেছে। নিত্যানন্দ-হরিদাসের ধড়ে প্রাণ আসিল। তাঁহারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করিয়া পরস্পর প্রেমে কোলাকুলি করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণকথা কহিতেছিলেন। এমন সময় নিত্যানন্দ ও হরিদাস আসিয়া অদ্যকার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। গঙ্গাদাস ও শ্রীবাস আচার্য্য জগাই-মাধাইয়ের চরিত্র বিশেষ অবগত ছিলেন। তাঁহারা উহাদের সমস্ত কুচেষ্টার কথা মহাপ্রভুর নিকট বর্ণনা করিলেন। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন—“প্রভো! আমার এক নিবেদন আছে। আমার সোজা কথা। তুমি যদি এই দুই জনকে উদ্ধার না কর, তবে ইহারা থাকিতে আমি আর কোথাও যাইব না। যাঁহারা স্বভাবতঃই ধার্ম্মিক, তাঁহাদিগকে হরিনামে

নাচাইতে, কাঁদাইতে, মাতাইতে কে না পারে ? তাহাতে একটা গৌরব কি ? যদি তুমি এই দুই মাতালকে হরিনামে উদ্ধার করিয়া হরিপ্রেমে কাঁদাইতে পার, তবেই বুঝিব তোমার মহিমা।”

শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন—“শ্রীপাদ ! বুঝিলাম, কৃষ্ণ অচিরেই উহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। যখন উহারা তোমার দর্শন পাইয়াছে, বিশেষতঃ তুমি উহাদিগের মঙ্গল চিন্তা করিতেছ, তখন সেই দুই জনের উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই।”

“হাসি বলে বিশ্বম্ভর পাইবে উদ্ধার
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার।
বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল,
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল।”

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাসঠাকুর একটু দূরে যাইয়া অদ্বৈত প্রভুর কাছে রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—“দেখ প্রভু, মহাপ্রভুর কি রকম চমৎকার ব্যবস্থা ! আমাকে এই চঞ্চলের সঙ্গে নিত্য পাঠাইয়া দেন। আমি যদি যাই উত্তরে, তিনি চলেন দক্ষিণে। গঙ্গার দিকে গেলেই একবার জলে নামিয়া সাঁতার দেওয়া চাই। গঙ্গায় কুমীর ভাসিতেছে দেখিয়া তিনি সাঁতার কাটিয়া তাহাকে ধরিতে যান, আমি তীরে থাকিয়া কেবল ডাক পাড়ি আর হায় হায় করি, একবার ফিরিয়াও চাহেন না। এইরূপ তাঁর লীলা। রাস্তায় ছোট বালক-বালিকা দেখিয়া মুখভঙ্গী করিয়া তাহাদিগকে

ভয় দেখান এবং যেন আক্রোশ করিয়া মারিবার জন্য তাহাদিগের পশ্চাৎ দৌড়াইতে থাকেন। ফলে শিশুদের পিতামাতা হাতে ঠেঙ্গা লইয়া ঠাকুরকে মারিতে আইসে। আমি তাহাদের হাতে পায়ে ধরিয়া নিরস্ত করিয়া পাঠাই। কত বা বলিব; গোয়ালারা রাস্তা দিয়া যায়, আর এই ঠাকুরটি গিয়া তাহাদের ঘৃত-দধি লইয়া একেবারে লম্বা দৌড়! তাঁহার নাগাল না পাইয়া উহারা আমাকেই আসিয়া ধরে। মাঠে পরের গাবী চরিতেছে, তিনি যাইয়া তাহার বাঁটে মুখ লাগাইয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন। কখন বা একটা ষাঁড়ের পিঠেই চড়িয়া বসিলেন। সে বেচারি শিঙ্ নাড়িয়া লম্ফে-ঝম্ফে ছুটিল, আর তিনি তার পিঠের উপরে থাকিয়া পা দোলাইয়া বলিতে লাগিলেন—'এই দেখ্, আমি মহাদেব।'

এই ত তাঁর কীর্ত্তি। তার পর, আমি যদি একটু বুঝাইতে যাই, তবে আমাকে যাহা বলিবার, তাহা ত বলেনই, অধিকন্তু তোমাকে গালি দিয়া বলেন—'তোমার অদ্বৈত আমার কি করিতে পারে? আর তুমি যারে মহাপ্রভু মহাপ্রভু বল, সেই চৈতন্যই বা আমার কি করিতে পারে?' আমি এ সকল কথা মনে মনে রাখি, কাহাকেও বলি না। ইহাঁর বুদ্ধির দোষে আজ যে দুই মাতালের হাতে পড়িয়াছিলাম! তোমার কৃপা ছিল, তাই ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণ লইয়া আসিয়াছি।"

ভঙ্গী করিয়া কথা বলিতে শ্রীঅদ্বৈতও কম পাত্র ছিলেন না। তিনি হরিদাসঠাকুরের ব্যাজস্তুতি শুনিয়া হাসিয়া উত্তর

করিলেন—"মাতালকে নাম শুনাইতে গিয়াছিলেন, উপযুক্তই হইয়াছে। মদ্যপের সহিত মদ্যপের সঙ্গ হওয়াই স্বাভাবিক। ইনি যেমন মাতাল, তেমনি গিয়াছিলেন আর দুই মাতালের সঙ্গ করিতে। কিন্তু, হরিদাস! তুমি নৈষ্ঠিক হইয়া সেই সঙ্গে গেলে কেন? আমি এই নিত্যানন্দের চরিত্র ভালরূপই জানি। দেখিবে, দু'দিন পরে এই দুই জনকে লইয়া নিমাই নিতাই একত্রে নাচিবেন। সব একাকার হইতে আর বিলম্ব নাই। চল, এই বেলা তুমি আর আমি জাতি লইয়া পলাই।"

"দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া,
নিমাই নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া।
একাকার করিবেক এই দুই জনে,
জাতি লয়ে তুমি আমি পলাই যতনে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

কিছু দিন পরে জগাই-মাধাই, যে পথে মহাপ্রভু নিত্য গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তাহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া আড্ডা করিল। সে স্থান মহাপ্রভুর বাটী হইতে বেশী দূর নয়। সকলে তটস্থ। উহাদের ভয়ে সন্ধ্যার পর কেহ ঘরের বাহির হন না। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন রাত্রিকালে ভক্তগণের সঙ্গে মিলিয়া কীর্ত্তন করেন, তখন উহারা বাড়ীর বাহিরে থাকিয়া কীর্ত্তন শুনে, আর নেশার ঝোঁকে মৃদঙ্গ-করতালের তালে তালে নাচে, আর হৈ হৈ করে। মহাপ্রভু যখন প্রাতে গঙ্গাস্নানে যান, তখন জগাই-মাধাই তাঁহার নিকট যাইয়া বলে—"ওহে নিমাই পণ্ডিত!

বেশ ত গানের দল করিয়াছ! বলিয়া রাখিলাম, একদিন আমাদের বাড়ী যাইয়া একপালা মঙ্গলচণ্ডীর গান গাইতে হইবে। কিন্তু গায়েনগুলা ভাল হওয়া চাই। আর যাহা যাহা দরকার, সে সব আমরা যেখানে পাই, আনিয়া যোগাড় করিয়া দিব।” মহাপ্রভু উহাদিগকে দেখিয়া একটু দূরে দূরে থাকিয়া চলিয়া যান।

একদিন নিত্যানন্দ নগরভ্রমণ করিয়া, বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই, রাত্রিকালে সেই পথ দিয়া মহাপ্রভুর বাড়ীতে ফিরিতেছেন, এমন সময়ে পথে জগাই-মাধাইয়ের সঙ্গে দেখা। আজ হরিদাস ঠাকুর সঙ্গে ছিলেন না, নিতাই একলা। জগাই-মাধাই নিত্যানন্দের সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া বলিল—“তুমি কে?” নিতাই বলিলেন—“আমার নাম অবধূত।” নিত্যানন্দের কথা শেষ হইতে না হইতেই “আরে, সে দিনকার সে বেটা রে, সে বেটা” বলিয়াই মাধাই একটা ভাঙ্গা কলসীর কান্ধা মাটী হইতে তুলিয়া লইয়া নিত্যানন্দের কপালে ছুড়িয়া মারিল। দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। নিতাইয়ের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আজ নিতাইচাঁদ উহাদিগকে উদ্ধার করিতেই আসিয়াছেন, মার খাইয়াও প্রেম বিলাইবেন বলিয়াই আসিয়াছেন। প্রেমে বিহ্বল নিত্যানন্দ সেই কঠোর আঘাতকে পুষ্পাঘাত তুল্য জ্ঞান করিলেন, এবং আপনার শত্রুকে কোল দিবার জন্য বাহু প্রসারিয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন—

"মাধাই রে! মেরেছিস মেরেছিস কলসীর কানা,
ওরে, তাই বলে কি প্রেম দিব না?"

"আয় ভাই! বুকে আয়! একবার মেরেছিস, না হয় আবার মার্, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। কিন্তু ঐ মুখে একটি-বার হরি বল্। তোদের মুখে হরিবোল শুনিবার জন্য আমি বহুদূর হইতে আসিয়াছি। তোরা দুভাই হরি বলিয়া আমাকে কিনিয়া নে। হরি ভজিলে, আমি বিনামূলে তোদের কাছে বিকাইব।

মানুষ না দেবতা? ইহা কি মানুষে পারে? এমন দারুণ প্রহারেও নিতাইয়ের বদন প্রসন্ন, নয়নে করুণার ধারা। আর শত্রুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য পরিসর-বক্ষ অগ্রসর ও ভুজদ্বয় প্রসারিত, মুখে হরিনাম! পাঠক, একবার চাহিয়া দেখ— করুণার সাগর নিতাইচাঁদকে দেখ, সর্ব্বাঙ্গে যেন করুণার ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। মরি মরি! কি দুর্ল্লভ দর্শন। নিত্যা-নন্দের শরীর বুঝিবা রক্তমাংসের শরীর নহে। কেমন করুণামাখা স্নিগ্ধ কমনীয় কান্তি। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের করুণা-রাশি যেন মূর্ত্তি ধরিয়া আজ নদীয়ার রাজপথে অবতীর্ণ! অক্রোধ পরমানন্দ নিতাই চক্ষের জলে ভাসিয়া, করুণা-কাতর দৃষ্টিতে জগাই-মাধাইয়ের পানে চাহিয়া আবার বলিলেন,—

"ভাই রে!
বল কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লও কৃষ্ণ নাম,
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ।"

নিতাইয়ের প্রেমে একটি পাষাণ গলিল—জগাইর প্রাণ দ্রব হইল। মাধাই পুনর্ব্বার কলসীর কানা তুলিয়া নিত্যানন্দকে মারিতে উদ্যত হইলে জগাই তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, এবং বলিল—"মাধাই! এই দেশান্তরী সন্ন্যাসীকে মারিয়া কি লাভ? চাহিয়া দেখ্, ইঁহার অঙ্গে রক্তের ধারা বহিতেছে, তথাপি হাসিমুখে হরি নাম করিতেছেন! দেখ্ দেখ্, আমাদিগকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারিয়া আছেন! আহা! হরিনাম যে এত মধুর, তাহা ত ভাই আগে জানি নাই। আয় ভাই! আমরাও হরি বলি। কলসীর কান্ধা ফেলিয়া দে।"

শ্রীগৌরাঙ্গ লোকমুখে নিত্যানন্দের বিপদের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সাঙ্গোপাঙ্গে আসিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। নিতাইয়ের দেহে শোণিত-পাত দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। 'চক্র চক্র' বলিয়া ঘন ঘন হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। মহতের অতিক্রম, ভক্তের গ্লানি তিনি কেমন করিয়া সহিবেন? তাই সুদর্শন-চক্রকে স্মরণ করিলেন। প্রেমদাতার শিরোমণি নিতাই তাহা দেখিয়া বলিলেন—"ও কি কর প্রভু? আমার কথা শুন, আমার কথা শুন। এই জগাইয়ের কোনও দোষ নাই। মাধাই দ্বিতীয়বার মারিতে উদ্যত হইলে জগাই আমাকে তাহা হইতে প্রাণে রক্ষা করিয়াছে। দৈবে একটু রক্ত পড়িয়াছে, কিন্তু আমি ব্যথা পাই নাই। প্রভু, তুমি ক্ষান্ত হও, ইহাদিগকে ক্ষমা কর। এই দুই জনের শরীর আমাকে ভিক্ষা দাও।"

নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। জগাই তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে শুনিয়া, মহাপ্রভু জগাইকে ধরিয়া কোল দিলেন, এবং বলিলেন—"জগাই রে! আজ নিত্যানন্দের প্রাণ রাখিয়া তুই আমাকে কিনিয়া নিলি। কৃষ্ণ তোর কুশল করুন। আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোর প্রেমভক্তি লাভ হউক।"

"জগায়েরে বলেন কৃষ্ণ কৃপা করুন তোরে,
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলে তুই মোরে।
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ তাহা তুমি মাগ,
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তি লাভ।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

জগাইয়ের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা দেখিয়া ভক্তমণ্ডলী হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাইকে কিছুকাল বক্ষে ধারণ করিয়া রহিলেন। তাঁহার শক্তিসঞ্চারী স্পর্শ জগাই সহ্য করিতে পারিল না, তাঁহার শক্তি সে ধারণ করিতে পারিল না। জগাই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মহাপ্রভুর কোল হইতে খসিয়া তাঁহার চরণমূলে পতিত হইল। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া কাঁদিয়া লোটাপুটি করিতে লাগিল। আহা! কি ভাগ্য! মহাপ্রভুর কি দয়া! স্পর্শমণির ধর্ম্ম এই যে, সে স্পর্শ করিবামাত্র লৌহ স্বর্ণ হয়। স্পর্শমণি লৌহের ভাল মন্দ বাছে না। লৌহ নরহত্যা করিয়া নরশোণিতে কলঙ্কিতই হউক, কিংবা ঠাকুর-সেবার কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকুক, যাহাই হউক না কেন, একবার

পরশ-মণির পরশ পাইলেই সে খাঁটি সোণা! আজ আমাদের গৌরাঙ্গ-পরশ-মণির স্পর্শে জগাই খাঁটি সোণা হইয়া গেল।

মাধাই অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। জগাইয়ের পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিল। মাধাই এক অচিন্তনীয় শক্তিতে অবশ হইয়া মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "দোহাই প্রভু, আমাকে কৃপা কর। আমরা জগাই-মাধাই দুই ভাই চিরকাল এক সঙ্গে পাপ করিয়াছি। আজ জগাই তরিয়া গেল, আর আমি একলা পড়িয়া রহিলাম। ঠাকুর! আমাকেও কৃপা করিতে হইবে, আমি তোমার চরণে পড়িয়া রহিলাম।"

"দুই জনে এক ঠাঞি কৈল প্রভু পাপ,
অনুগ্রহ কেন প্রভু কর দুই ভাগ।"

মহাপ্রভু বলিলেন—"তোমাকে কৃপা করিবার শক্তি আমার নাই। তুমি নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়া তাঁহার স্থানেই অপরাধ করিয়াছ। তাঁহার চরণে গিয়া পড়। যদি তিনি কৃপা করেন, তবেই তোমার উদ্ধার হইবে, নতুবা উদ্ধার নাই।"

মাধাই যাইয়া নিত্যানন্দের চরণ ধরিয়া পড়িল।

"পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন,
ধরিল অমূল্য ধন নিতাই-চরণ।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন—"শ্রীপাদ! তুমি করুণার সাগর। মাধাই তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করিল। ইহাকে

তুমি কৃপা কর।" নিত্যানন্দ বলিলেন—"প্রভো! কেন আর ছলনা করিতেছ? ইহাকে উদ্ধার করিয়া লও। আমি ত ইহার অপরাধ পূর্ব্বেই ক্ষমা করিয়াছি। এক্ষণে তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি যে, কোন জন্মে যদি আমার কিছুমাত্র সুকৃতি থাকে, তবে তাহা আমি মাধাইকে দিলাম। ইহার সমস্ত অপরাধ আমি লইলাম। তুমি ছলনা ছাড়িয়া ইহাকে কৃপা কর।"

মহাপ্রভু বলিলেন—"শ্রীপাদ! যদি ইহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলে, তবে এক্ষণে আলিঙ্গনদানে ইহাকে কৃতার্থ কর।"

অক্রোধ পরমানন্দ নিতাই মাধাইকে হৃদয়ে ধরিয়া শক্তি-সঞ্চার করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সকল বন্ধন মোচন হইল। ভক্তেরা দেখিলেন যে, মাধাই সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হইল!

"মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা,
সর্ব্বশক্তিসমন্বিত মাধাই হইলা।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

জগাই-মাধাই দুই ভাই গৌর-নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করিয়া অনুতাপসহকারে কাঁদিতে লাগিল। তখন মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"জগাই-মাধাই! অদ্য হইতে তোমরা দুই ভাই নিষ্পাপ হইলে। তোমরা যদি পুনরায় পাপ না কর, তাহা হইলে তোমাদিগের জন্মজন্মান্তরের যত পাপ আছে, সে সমস্তের ভার আমি গ্রহণ করিলাম। আর ভয় নাই। নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন কর। অদ্য হইতে

আমি তোমাদের মুখে আহার করিব এবং তোমাদিগের দুই-জনের দেহে আমি বিরাজ করিব।”

“কোটী কোটী জন্মে যত আছে পাপ তোর,
আর যদি না করিস্ সব দায় মোর।
তো দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার,
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার।”

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

জগাই-মাধাই মহাপ্রভুর আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া, তাঁহার এমন কৃপা দেখিয়া, আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মহাপ্রভু ভক্ত-গণকে বলিলেন, “এখন এই দুইজনকে তুলিয়া লইয়া চল। গৃহে যাইয়া ইহাদিগকে লইয়া আজ মহাকীর্ত্তন করিব, এবং ইহাদিগকে জগতের উত্তম করিয়া লইব। এখন ইহাদিগের স্পর্শমাত্র যাহারা গঙ্গাস্নান করে, অতঃপর তাহারা এই দুই জনের স্পর্শ গঙ্গাস্নান-তুল্য জ্ঞান করিবে।”

“এই দুই পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান,
এ দোঁহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান।”

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ভক্তগণ জগাই-মাধাইকে অচেতন অবস্থায় ধরাধরি করিয়া মহাপ্রভুর বাড়ীতে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভুকে বেষ্টন করিয়া শ্রীঅদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর, শ্রীবাস, গদাধর, গঙ্গাদাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, মুকুন্দ, বাসুদেব ও মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি মহাসভা মিলাইয়া বসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে জগাই-মাধাই সংজ্ঞালাভ করিলে, মহাপ্রভু সকলকে বলিলেন—

"ইহারা দুই জন তোমাদিগের যার যার কাছে যে যে অপরাধ করিয়াছে, তৎসমুদয় তোমরা ক্ষমা কর।" দুই ভাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া একে একে সকলের চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। ভক্তগণ তাহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন মহাপ্রভু বলিলেন—"ভক্তগণ! তোমরা অতঃপর এই দুই জনকে আর পাপী জ্ঞান করিও না। অদ্যাবধি ইহারা নিষ্পাপ হইল। জানিও, ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করিলে আমাকেই শ্রদ্ধা করা হইবে। এক্ষণে সংকীর্ত্তন আরম্ভ কর।"

অদ্য কীর্ত্তন আরম্ভ হইতে না হইতেই মহাপ্রভু নৃত্য করিতে উঠিলেন। সকলের উচ্ছ্বাসপূর্ণ হরিধ্বনিতে দশদিক্ পূর্ণ হইল। মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বর প্রভৃতি উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। আজ গৌরভক্ত-বৃন্দের আনন্দের সীমা নাই। সকলেই নাচিতেছেন, সকলেই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আর নাচিতেছেন—জগাই-মাধাই দুই ভাই। তাঁহাদিগের প্রাণের ভিতরে আজ এক নূতন আনন্দময় রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। উভয়ে নাচিতেছেন, উচ্চৈঃস্বরে হরিবোল বলিতেছেন, আর দুনয়নে যেন সুরধুনী বহিয়া যাইতেছে। দুরন্ত জগাই-মাধাই আজ হরিনামে হার মানিল। নিতাই-গৌরাঙ্গের প্রভাব দেখিয়া পণ্ডিতের নবদ্বীপ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল!

"দুরন্ত সেই জগাই-মাধাই হার মেনেছে হরিনামে,
হরি হরি ব'লে ভাসিতেছে গৌরপ্রেমে।"

এস্থলে মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, নবদ্বীপে এত জ্ঞানী, এত পণ্ডিত জন—এত ভাল ভাল লোক থাকিতে সেই দুরাচারী জগাই-মাধাই এত সহজে ভক্তির পথে আসিল কেমন করিয়া ? তাহারা দুইজন না করিয়াছে এমন দুষ্কর্ম্ম নাকি নাই। এমন কি তাহাদিগের উদ্ধারের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাও একটি মহা গুরুতর অপরাধেরই কর্ম্ম। কি ? না পরম কারুণিক শ্রীমন্নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত ! আমাদের গৌর-নিতাইয়ের দয়ার ভঙ্গীটা দেখিয়া তাঁহাদের বলিহারি যাই। এত লোক থাকিতে সকলের আগে দয়ার উপযুক্ত পাত্র হইলেন কিনা সেই সর্ব্বজন-ঘৃণিত ও সকল দুষ্কর্ম্মের নায়ক জগাই আর মাধাই ! কিন্তু ভাই, ইহার অবশ্য একটা মীমাংসা আছেই আছে। তাঁহাদের চক্ষু আর তোমার-আমার চক্ষু একরূপ নয়। বাহিরের সাফ-সাফাই দেখিয়া তুমি-আমি যাহাকে সুপাত্র মনে করি, তাঁহারা হয়ত সেই ব্যক্তির অন্তরের লুক্কায়িত গলদ্ দেখিয়া তাহাকে নিতান্ত অপাত্র বলিয়াই জানেন। একটা কথা এই যে, সোজা-সরল প্রাণ ভক্তিপথের একটা মস্ত সম্বল। প্রাণটি সরল না হইলে তুমি একজন গণ্য-মান্য দশকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি হইয়াও এপথে সহজে অগ্রসর হইতে পারিবে না। একজন সুরাসক্ত মাতালকে দেখিয়া হয়ত তুমি ঘৃণাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাক। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি শাদা-সিদে সরল লোক হয়, তবে জানিও, তাঁহার পক্ষে ভক্তি লাভ করা যত সহজ, একজন কুটিল, পরনিন্দক ভব্য-সব্য পণ্ডিতের পক্ষে উহা

তত সহজ নহে। জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের কথা বলিতে গিয়া শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কি বলিয়াছেন, শুন—

"সর্ব্ব পাপ সেই দুই শরীরে জন্মিল,
বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ সবে না হইল।
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে,
নহিল বৈষ্ণব-নিন্দা এই সব পাকে।
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয়,
সর্ব্ব ধর্ম্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয়।
সন্ন্যাসী-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম্ম,
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম।
মদ্যপের নিস্কৃতি আছয়ে কোন কালে,
পর চর্চ্চকের গতি কভু নাহি ভালে।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

হরিদাস ঠাকুর যত দিন নবদ্বীপে ছিলেন, তত দিন তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মিলিয়া হরিনাম প্রচার করিতেন। কারণ, উহা শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ। মহাপ্রভুর হরিসংকীর্ত্তনের মধ্যেও তাঁহার ভক্তিবিলসিত উজ্জ্বল মূর্ত্তি আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। কিন্তু এখানে তিনি নিজে প্রধান হইয়া কিছুই করেন নাই। এজন্য এ সময়ে তাঁহার জীবনের তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাওয়া যায় না। নবদ্বীপে তাঁহার নিজের কিছুই করিবার ছিল না। যাহা কিছু করিয়াছেন, মহাপ্রভুর আজ্ঞাধীন হইয়া। তিনি কেবল চক্ষু ভরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা দর্শন

করিতেন, আর প্রাণ ভরিয়া তাহা সম্ভোগ করিতেন। বস্তুতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলারসে তিনি আপনার ব্যক্তিত্ব একবারে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।

বিনয়, সৌজন্য ও তৃণাদপি সুনীচের ভাবটা হরিদাসঠাকুরের সারা জীবনে পরিলক্ষিত হয়। ভক্তগণ ও প্রভু তিন জন তাঁহাকে কত মর্য্যাদা দিতেন ও কত আদর করিতেন। কিন্তু তাহাতে তিনি আরও জড়সড় হইয়া থাকিতেন। কিসে কখন কাহার মর্য্যাদাভঙ্গ হয়,এই ভয়েই তিনি সর্ব্বদা তটস্থ থাকিতেন। মহাপ্রভু দণ্ডে দণ্ডেই হরিদাস ঠাকুরের খবর লইতেন। প্রভু আহারে যাইতেছেন, তখন "হরিদাস কোথায়" বলিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। কিন্তু হরিদাস একান্ত কাতরতার সহিত বলিলেন যে, তিনি অধম, সকলের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে যোগ্য নহেন, সকলের আহারান্তে বাহিরে বসিয়া এক মুষ্টি প্রসাদ পাইবেন।

"হরিদাস বলে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম,
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিব ভোজন।"

(শ্রী চৈঃ চঃ)

যেরূপে হরিনাম গ্রহণ করিলে কৃষ্ণপদে প্রেম জন্মে, তাহার লক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু বিখ্যাত 'তৃণাদপি' শ্লোকে বলিয়াছিলেন। হরিদাস ঠাকুর যেন সেই শ্লোকোক্ত লক্ষণসমষ্টির মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন। শ্লোকটি এই—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। ডুবিলেন।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" "প্রেমা-

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পয়ারে ইহার সুন্দর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"উত্তম হৈয়া আপনাকে মানে তৃণাধম,
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়,
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়।
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন,
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ।
উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান,
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।
এইমত হৈয়া যেই কৃষ্ণ নাম লয়,
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয়।"

অন্তম পরিচ্ছেদ

নীলাচলে

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ-লীলা সাঙ্গ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণান্তর যখন নালাচলে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত, এই চারিজন গিয়াছিলেন। মহাপ্রভু আর কাহাকেও সঙ্গে নিলেন না।

ঠাকুর কাঁদিয়া বলিলেন, "প্রভো! তুমি ত নীলাচলে । আমার গতি কি হইবে? আমি তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া বাঁচিব?"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—

"তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন,
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে যাইয়া কিছুকাল অবস্থানের পর তীর্থ-দর্শনোপলক্ষে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। বৎসরাধিক কাল দক্ষিণের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, গৌড়ীয় ভক্তগণকে তথায় আসিবার জন্য লোকমুখে সংবাদ প্রেরণ করেন। তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া, ভক্তগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে অগ্রণী করিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরও আসিলেন। মহাপ্রভু কাশী মিশ্রের এক উদ্যান-বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, ভক্তগণ যাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। হরিদাসঠাকুর তাঁহার স্বভাব-সুলভ সঙ্কোচ বশতঃ মহাপ্রভুর বাটীতে না যাইয়া বাহিরে পথের পার্শ্বে বসিয়া নাম করিতে লাগিলেন।

"মিলন স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা,
রাজপথ প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া আনন্দ-সাগরে ডুবিলেন। মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথমে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সহিত নমস্কারপ্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক একে একে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, তিনি আসিয়া পথের ধারে বসিয়া রহিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। লোকেরা হরিদাসঠাকুরের নিকট যাইয়া মহাপ্রভুর আজ্ঞা জানাইল। কিন্তু হরিদাসঠাকুর বলিলেন—"আমি নীচজাতি, শ্রীমন্দিরের নিকট দিয়া যাইতে আমার অধিকার নাই। যদি শ্রীমন্দির হইতে কিছু দূরে নির্জ্জনমত একটু স্থান পাই, তবে সেখানেই পড়িয়া থাকিব, এক প্রকারে দিন কাটিয়া যাইবে। এ অঞ্চলে থাকিলেই হয় ত কখন অলক্ষিতে জগন্নাথের কোন সেবককে স্পর্শ করিয়া অপরাধের ভাগী হইব, এই আশঙ্কা। আমার ইচ্ছা যে, একটু দূরে যাইয়া থাকি, তাহা হইলে সে ভয় থাকিবে না।"

লোকেরা যাইয়া সে কথা মহাপ্রভুকে জানাইল। হরিদাস ঠাকুরের এইরূপ বিনয়, সাবধানতা ও মর্য্যাদাবোধ দেখিয়া মহাপ্রভু মনে মনে সুখী হইলেন এবং তাঁহাকে একটি স্বতন্ত্র স্থানে বাসা দিবার জন্য সংকল্প করিলেন।

"এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল,
শুনি মহাপ্রভু মনে বড় সুখ পাইল।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

যাঁহারা বিধি-নিষেধের অতীত নিষ্কাম প্রেম-ভক্তি-যোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ অধিকারী সন্দেহ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু জাতিনির্ব্বিশেষে এইরূপ উন্নত অধিকারী ভক্তগণের সহিত সর্ব্বদা প্রেমে গলাগলি করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি বর্ণ ও আশ্রমের মর্য্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ করেন নাই। এই কারণে তাঁহার অনুগত বৈষ্ণবগণ সকলেই মর্য্যাদাবোধসম্পন্ন ছিলেন। কোনও সমাজের, সম্প্রদায়ের অথবা ব্যক্তির মর্য্যাদালঙ্ঘন তাঁহাদিগের নিকট গুরুতর অপরাধের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

এ দিকে কাশীমিশ্র পূর্ব্ব হইতেই ভক্তগণের জন্য বাসস্থান ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বাসায় পৌঁছাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার ভার গোপীনাথ আচার্য্যের উপর পড়িল এবং ভক্তগণের সেবার বন্দোবস্তের ভার থাকিল বাণীনাথ পট্টনায়কের উপর। ভাগ্যবান কাশীমিশ্র বৈষ্ণবগণের নীলাচলে অবস্থানের সমস্ত ব্যয় সমাধান করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইয়া মহাপ্রভুর অনুমতি পূর্ব্বেই চাহিয়া লইয়াছিলেন। মহাপ্রভু কাশীমিশ্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী তোমার নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে যে একখানি ঘর আছে, তাহা আমাকে দিতে হইবে। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।" তাহাতে কাশীমিশ্র বলিলেন, "ঠাকুর, তোমারই ত সব। আমাকে জিজ্ঞাসার আর প্রয়োজন কি?"

গোপীনাথ আচার্য্য মহাশয় সমস্ত বাসা সংস্কার পূর্ব্বক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাইয়া রাখিলেন। বাণীনাথ প্রচুর পরিমাণে

অন্ন, পিঠা, পানা প্রভৃতি বিবিধ মহাপ্রসাদ লইয়া মহাপ্রভুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত প্রস্তুত জানিয়া মহাপ্রভু বৈষ্ণবগণকে স্নান-আহ্নিক করিতে আপন আপন বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। বৈষ্ণবগণ বিদায় হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া হরিদাসকে দেখিবার জন্য আকুল হইয়া রাজপথে চলিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, হরিদাস পথের ধারে বসিয়া প্রেমানন্দে নাম-সংকীর্ত্তন করিতেছেন, নয়নে ধারা বহিতেছে। মহাপ্রভুকে দেখিয়াই হরিদাস তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দুই হস্তে ধরিয়া তুলিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রেমে কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

"তবে প্রভু আইলা হরিদাস মিলনে ;
হরিদাস করে প্রেমে নাম সংকীর্ত্তনে।
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হঞা,
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইয়া।
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে,
প্রভু-গুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্য-গুণে।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

হরিদাস কাঁদিতেছেন, আর বলিতেছেন—"প্রভো! কি কর? কি কর? আমাকে ছুঁইলে? আমি অস্পৃশ্য অধম, আমাকে ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও।"

তখন মহাপ্রভু যে উত্তর করিয়াছিলেন, সেই হৃৎকর্ণ-রসায়ন কথা গ্রন্থের প্রারম্ভেই একবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি।

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে,
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান,
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ, তপ, দান।
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন,
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

মহাপ্রভু কি হরিদাস ঠাকুরের অতিস্তুতি করিলেন? না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

অর্থ—যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও পূজ্যতম। যেহেতু যাঁহারা তোমার নাম করেন, তাঁহারাই তপশ্চারী তাঁহারাই হোমকারী, তাঁহারাই তীর্থস্নায়ী, তাঁহারাই সদাচারী আর্য্য এবং তাঁহারাই বেদাধ্যায়ী।

অতঃপর মহাপ্রভু হরিদাসঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া কাশীমিশ্রের পুষ্পোদ্যানে লইয়া গিয়া সেই নির্জ্জন গৃহে তাঁহাকে বাসা দিলেন, এবং বলিলেন,—"তুমি এই স্থানে থাকিয়াই নামকীর্ত্তন করিবে এবং শ্রীমন্দিরের চূড়া ও চক্র দর্শন করিবে। এই স্থানেই তোমার জন্য মহাপ্রসাদ আসিবে। আমি প্রত্যহ একবার

সিদ্ধবকুল—হরিদাস ঠাকুরের ভজন-স্থান, পুরীধাম। ১১৭ পৃঃ

আসিয়া তোমায় সঙ্গ করিব।” ঠাকুর হরিদাস তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকিয়া সাধন-ভজন করিয়াছিলেন। উক্ত স্থান এক্ষণে “সিদ্ধ বকুল” নামে প্রসিদ্ধ। হরিদাসকে তাঁহার বাসায় রাখিয়া মহাপ্রভু সমুদ্রস্নানান্তে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিয়াই অগ্রে আপন সেবক গোবিন্দের দ্বারা হরিদাসঠাকুরের জন্য মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন, পরে ভক্তগণ সঙ্গে নিজে প্রসাদ পাইতে বসিলেন।

উক্ত গোবিন্দ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক ছিলেন। তাঁহারই আদেশক্রমে মহাপ্রভু ইঁহাকে আপনার সেবকরূপে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া কখন কখন কোনও কোনও উদ্যানবাটীতে যাইয়া সংকীর্ত্তন-মহোৎসব করিতেন। হরিদাসঠাকুরও সেই সঙ্গে কীর্ত্তনে-নর্ত্তনে যোগ দান করিতেন। কিন্তু ভোজনের সময় বৈষ্ণবগণের পংক্তি ছাড়িয়া দূরে যাইয়া স্বতন্ত্রভাবে বসিতেন। আহারের সময় উপস্থিত হইলেই মহাপ্রভু সর্ব্বাগ্রে হরিদাসঠাকুরের সন্ধান লইতেন। কিন্তু হরিদাসঠাকুর মর্য্যাদালঙ্ঘনের ভয়ে কাছে ঘনাইতেন না।

“হরিদাস” বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন,
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন।
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে,
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তারে।”

(শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীরূপের আগমন

এই সময়ে একদিন শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে হরিদাসঠাকুরের স্থানে যাইয়া বাসা লইলেন। তিনি মহাপ্রভুর বাটীতে গেলেন না। এইরূপ করিবার বিশেষ কারণ ছিল। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি জীবনের প্রথম ভাগে গৌড়ের ম্লেচ্ছ বাদশাহের চাকুরী করিবার সময় সদাচার-ভ্রষ্ট ও 'দবির খাস' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এ নিমিত্ত সামাজিক হিসাবে আপনাকে পতিত জ্ঞান করিতেন। মহাবিজ্ঞ, মহাদিগ্‌গজ পণ্ডিত ও বহু বৈষ্ণব-শাস্ত্রের প্রণয়নকর্ত্তা পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীর এই প্রকার বিনয় এক অদ্ভুত বস্তু, সন্দেহ নাই। রূপ গোস্বামী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু,' 'বিদগ্ধমাধব,' 'ললিতমাধব,' 'উজ্জ্বল-নীলমণি,' 'দানকেলি-কৌমুদী,' 'গোবিন্দবিরুদাবলী,' ও 'লঘুভাগবতামৃত' প্রভৃতি অসংখ্য বৈষ্ণবগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, এজন্য তিনি বৈষ্ণব-সমাজের একটি প্রধান এবং উজ্জ্বল স্তম্ভস্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকেন। হরিদাসঠাকুরের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল। তিনি যত কাল পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ছিলেন, হরিদাসঠাকুরের আশ্রমেই ছিলেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন আসিয়া উভয়ের সহিত কৃষ্ণকথায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া যাইতেন।

হরিদাসঠাকুরের আশ্রমে অবস্থানকালে শ্রীরূপ গোস্বামী সুপ্রসিদ্ধ 'বিদগ্ধমাধব' নাটক রচনা করিতেছিলেন। একদিন মহাপ্রভু হরিদাসের স্থানে আসিয়া উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হাতে লইয়া উহার পাতা উল্টাইতেই, একটি শ্লোক বিশেষভাবে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি উহা পাঠ করিয়া একান্ত মুগ্ধ ও ভাবাবিষ্ট হইলেন, এবং হরিদাস ঠাকুরকে শ্লোকটি পড়িয়া শুনাইলেন।

হরিদাসঠাকুর শ্লোক শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং উহার শত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কথা সাধুমুখে শুনিয়াছি ও শাস্ত্রে দেখিয়াছি, কিন্তু নামমাধুর্য্য সম্বন্ধে এমন সুন্দর বর্ণনা আর কোথাও শুনি নাই।"

"শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী,
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি,
কৃষ্ণ-নামের মহিমা শাস্ত্র-সাধুমুখে জানি,
নামের মাধুর্য্য ঐছে কাঁহা নাহি শুনি "

(শ্রীচৈঃ চঃ)

হরিদাস ঠাকুর যে শ্লোকটির এত প্রশংসা করিলেন, যাহা পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও হরিদাসঠাকুর উভয়েই ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই বিখ্যাত শ্লোকটি এই—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।

চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।"

শ্লোকার্থ। 'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ যখন বদনমধ্যে অর্থাৎ রসনায় নৃত্য করে, তখন অসংখ্য রসনা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে ; যখন কর্ণ-কুহরে ক্রীড়াশীল হয়, তখন অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কর্ণপ্রাপ্তির বাসনা জন্মে ; আর যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে যাইয়া প্রবিষ্ট হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার স্তম্ভিত হয়। আহা ! এমন যে দুটি বর্ণ কৃষ্ণনাম, তাহা যে কি অমৃত দিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, জানি না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্ব-রাগের অবস্থায় কৃষ্ণনামের মাধুর্য্যে বিহ্বলা ব্রজাঙ্গনার উক্তি এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। নিম্ন-লিখিত পদটি উক্ত শ্লোকের অনুবাদ।

কীর্ত্তনের সুর—ঝাঁপতাল।

কৃষ্ণ ইতি আখর দুটি, বদনে যব বিলসতি,
বাঢ়য়ে রতি রসনা কোটি লাগি। (রে সখি)
মম শ্রবণ-কন্দরে, যবহু পুন ক্রীড়তি,
রতি শ্রবণ অর্ব্বুদ লাগি। (রে সখি)
যবহু পুন পরশে হৃদি, প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি
স্তব্ধ রহু মানি বহু ভাগি। (রে সখি)
কতহু সুধারস ছানি সৃজিলা বিহি না জানি
ধনিরে ধনি মরমে রহু জাগি। (রে সখি)

হরিনাম সকলেই করিয়া থাকেন। কিন্তু নামের শক্তিতে

তেমন জ্বলন্ত বিশ্বাস কয় জনের আছে ? শাস্ত্রে নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস না করা একটি নামাপরাধ। নামাপরাধ প্রধানতঃ দশটি ;—(১) সাধুনিন্দা। (২) শ্রীশিবের সত্য, নাম, গুণ প্রভৃতি শ্রীনারায়ণ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা। (৩) শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা অর্থাৎ সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি করা। (৪) হরিনামে অর্থবাদকল্পনা অর্থাৎ শ্রীহরিনামের মহিমা-সমূহকে কেবল প্রশংসামাত্র মনে করা। (৫) বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা। (৬) নাম-বলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি। (৭) শ্রীহরিনামের সহিত ব্রত, দান প্রভৃতি শুভ কর্ম্মের সমতুলনা। (৮) শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং যে শুনিতে অনিচ্ছুক, তাহাকে নাম করিতে উপদেশ দেওয়া। (৯) নামমাহাত্ম্য শুনিয়াও নাম করিতে প্রবৃত্ত না হওয়া। (১০) নামে অহংমমতাপর হওয়া অর্থাৎ আমি বহু নামকীর্ত্তন, গ্রহণ বা প্রচার করিয়া থাকি ইত্যাদি ভাব। নামাপরাধ হইলে পুনঃ পুনঃ নামগ্রহণ দ্বারাই সে অপরাধের ক্ষালন হইয়া থাকে।

নাম-মাহাত্ম্যে হরিদাস ঠাকুরের যেরূপ একান্ত বিশ্বাস ছিল, তাহা সকলের আদর্শস্থানীয়। কণামাত্র অগ্নির সংযোগে পর্ব্বত-প্রমাণ তৃণরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহা যেমন সুসত্য, তদ্রূপ হরিনামের আভাসেই জন্মজন্মান্তরের পাপপুঞ্জ দূরীকৃত হয়, ইহাও হরিদাসঠাকুরের নিকট তেমনই একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। ইহার ভিতরে যেন-বুঝি-হয়ত নাই।

একদিন মহাপ্রভু হরিদাসঠাকুরের কুটীরে আসিয়া কৃষ্ণকথা-

প্রসঙ্গে বলিলেন—"দেখ হরিদাস! এই কলিকালে ম্লেচ্ছ প্রবল। তাহারা অনাচারী ও সতত গো-ব্রাহ্মণের হিংসা করিয়া থাকে। কিরূপে ইহাদিগের উদ্ধার হইবে, তাহা ভাবিয়া আমার প্রাণে বড় ক্লেশ হয়।"

ঠাকুর হরিদাস বলিলেন—"প্রভো! সত্য বটে, যবনগণ মহা সংসারাসক্ত; সত্য বটে, তাহারা গোহত্যাকারী, দুরাচার-পরায়ণ; কিন্তু তথাপি উহারা সহজেই মুক্তি লাভ করিবে। উহারা যে কথায় কথায় 'হারাম' শব্দ উচ্চারণ করে, তাহার ভিতরে রামনামের আভাস রহিয়াছে। এই নামাভাসেই তাহাদের উদ্ধার হইয়া যাইবে। নামের শক্তি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না।"

"যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে,
হারাম! হারাম! বলি কহে নামাভাসে।
মহা প্রেমে ভক্ত কহে হা রাম! হা রাম!
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম।
যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে তাহা হয় নামাভাস,
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

এ স্থলে হরিদাসঠাকুর নৃসিংহপুরাণের একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইলেন।

"দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥"

অর্থ। যখন বরাহদন্তে আহত হইয়া ম্লেচ্ছ 'হারাম' 'হারাম'

উচ্চারণ করিয়াই মুক্তি লাভ করে, তখন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক রামনাম কীর্ত্তন করিলে যে মুক্তিলাভ হয়, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

ঠাকুর হরিদাস পুনরপি বলিলেন—"অজামিল আসন্নমৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া পুত্রের নাম ধরিয়া নারায়ণ-নারায়ণ বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাহাতেই—সেই নামাভাসেই তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।"

"অজামিল পুত্র বোলায় বলি নারায়ণ,
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন।"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥"

অর্থ। অজামিল মহাপাতকী হইয়াও পুত্রোপচারিত নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নামগ্রহণ করিলে যে জীব বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইবে, সে বিষয়ে আর কথা কি ?

"নামের অক্ষর সবের এই ত স্বভাব,
ব্যবহিত হৈলেও না ছাড়ে আপন প্রভাব।"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা,
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে,
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥"

(পদ্মপুরাণ)

অর্থ। ভগবানের নাম যাঁহার বাগিন্দ্রিয়ে, স্মরণপথে, অথবা কর্ণমূলে উদিত হয়, অর্থাৎ যিনি ভগবানের নাম রসনায় উচ্চারণ করেন বা মানসে স্মরণ করেন অথবা কর্ণে শ্রবণ করেন, এই একমাত্র নামই তাঁহাকে উদ্ধার করে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। নামের বর্ণ শুদ্ধ, অশুদ্ধ, ব্যবহিত অথবা ব্যবধানরহিত, যেরূপই হউক না কেন, তাহাতে ফলের তারতম্য হয় না। কিন্তু যদি এই নাম দেহ-ধন-জনাসক্ত পাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে, হে বিপ্র! এরূপ স্থলে নাম শীঘ্রই ফলজনক হয় না, অর্থাৎ একটু বিলম্বে হয়।

হরিদাসঠাকুরের নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে উক্ত প্রকার জ্বলন্ত বিশ্বাসের কথাসকল শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পুনরায় ভঙ্গী করিয়া কহিলেন—"হরিদাস! এই পৃথিবীতে অগণ্য অসংখ্য জীব ও স্থাবরজঙ্গম যত কিছু আছে, সে সকলের মুক্তি কিরূপে হইবে?"

"পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম,
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন?"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

তদুত্তরে হরিদাসঠাকুর বলিলেন—"প্রভো! সে ব্যবস্থা তুমি পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছ। তুমি যে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছ, তাহাতেই স্থাবরজঙ্গমের উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। জীবগণ তোমার শ্রীমুখের হরিধ্বনি শুনিয়াই মুক্ত হইয়াছে, আর স্থাবরসকলও সেই ধ্বনির তরঙ্গস্পর্শেই উদ্ধার পাইয়াছে। তুমি শ্রীবৃন্দাবন যাইবার কালে ঝারিখণ্ডের অরণ্যপথে যে কত হিংস্র পশুকেও কৃষ্ণনামে কাঁদাইয়াছিলে, নাচাইয়াছিলে, সে সব কাহিনী আমার অবিদিত নাই।"

"হরিদাস কহে প্রভু সে কৃপা তোমার,
স্থাবর জঙ্গমের আগে করিয়াছ নিস্তার।
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন,
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ।
শুনিয়াই জঙ্গমের হয় সংসার-ক্ষয়,
স্থাবরের শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয়।
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন,
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন।
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন,
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

নবম পরিচ্ছেদ

সনাতন-সঙ্গ

কিছুকাল গত হইলে শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুকে দেখিতে নীলাচলে আসিলেন, কিন্তু মহাপ্রভুর বাটীতে যাইয়া উঠিলেন না। শ্রীরূপের ন্যায় তিনিও ঠাকুর হরিদাসের আশ্রমে গিয়া উপনীত হইলেন। সনাতন গোস্বামী রূপ গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর। তিনি গৌড়ের বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল সাকর মল্লিক। প্রাণে বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে তিনি সমস্ত বিষয়-আশয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের পদে আত্মসমর্পণ করেন। ইনিও এক জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র 'হরিভক্তিবিলাস' ইহাঁরই লেখনী-প্রসূত। তদ্ভিন্ন 'বৃহৎভাগবতামৃত,' 'দশম টিপ্পনী' ও 'দশম চরিত' প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ লিখিয়া ইনি বৈষ্ণবসমাজে সর্ব্বজনপূজ্য হইয়াছেন। ইনিও শ্রীরূপের ন্যায় একান্ত দৈন্য ও বিনয় বশতঃই মহাপ্রভুর বাটীতে না গিয়া হরিদাসের কুটীরেই আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন।

সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে 'ভক্তমাল' বলেন—

> "মূর্ত্তিমান্ মহাতেজ, সমুদ্র-গম্ভীর,
> সাগরান্তা পৃথিবীর মধ্যে এক ধীর।"

বস্তুতঃ কি রূপগোস্বামী, কি সনাতন গোস্বামী, কি হরিদাস

ঠাকুর, ইহাঁদের সংযম, বৈরাগ্য, ভক্তি ও শক্তির কথা ভাবিলে মনে হয় যে, "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে" এই কথা অতীব সত্য, যথার্থ কথা। অপর দিকে ইহাঁদিগের নিষ্কিঞ্চনতা ও তৃণাদপি সুনীচের ভাব দেখিয়াও বিস্মিত হইতে হয়। এই তিন মহাপুরুষ মর্য্যাদালঙ্ঘনভয়ে কদাচ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে যাইতেন না!

"হরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপ সনাতন,
জগন্নাথ-মন্দিরে না যান তিন জন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিবার কালে অরণ্য-প্রদেশের জলের দোষে সনাতন গোস্বামীর গাত্রে কণ্ডূ উৎপন্ন হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই অমনি আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন, কিন্তু পাছে কণ্ডূ-রস মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগে, এই ভয়ে সনাতন দূরে সরিয়া গেলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে জোর করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে সনাতনের প্রাণে বড়ই দুঃখ হইল। সেই দুঃখে তিনি জগন্নাথের রথচক্রতলে পড়িয়া কণ্ডূরসায়িত ঘৃণিত দেহ বিসর্জ্জন দিতে মনে মনে সংকল্প করিলেন! মহাপ্রভু তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া এক দিন ঠাকুর হরিদাসের আশ্রমে আসিয়া অকস্মাৎ সনাতনকে বলিলেন—

"সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে,
কোটী দেহ ক্ষণেকে ত ছাড়িতে পারিয়ে।

দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে,
কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

প্রভু কেমন করিয়া মনের কথা জানিতে পারিলেন, ইহা ভাবিয়া সনাতন একান্ত বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভু পুনরায় বলিলেন—"সনাতন! তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছ। সুতরাং তোমার এই দেহ এক্ষণে আমার। অতএব ইহা বিনাশ করিবার অধিকার তোমার নাই। তুমি পরের দ্রব্য খোয়াইতে চাও, তোমার কি ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান নাই? এমন কার্য্য করিও না। এ শরীরে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ শরীর দ্বারা আমি বহু কার্য্য সাধন করিব।"

"প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজধন,
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ।
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে?
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন,
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

সনাতন গোস্বামী লজ্জায় অধোবদনে রহিলেন। মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে বলিলেন—"দেখ হরিদাস! আমরা এই নীতি-কথা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে, পরের গচ্ছিত দ্রব্য কোনও প্রকারে খোয়াইতে নাই। কিন্তু ইনি

পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাহিতেছেন। ইহাঁকে তুমি ভাল করিয়া সাবধান করিয়া দিও, যেন ইনি এমন অন্যায় কার্য্য না করেন।”

“হরিদাসে কহে প্রভু শুন হরিদাস,
পরের দ্রব্য ইঁহ চাহে করিতে বিনাশ।
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়,
নিষেধিও ইঁহায়, যেন না করে অন্যায়।”

(শ্রীচৈঃ চঃ)

মহাপ্রভু চলিয়া গেলে হরিদাস ঠাকুর সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন—“গোসাঞি! তোমার মতন ভাগ্যবান্ কে? তোমার দেহকে মহাপ্রভু তাঁহার নিজের দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান করেন, এ দেহ দ্বারা তিনি কত কার্য্য করাইয়া লইবেন। আর তুমি ইহাকে বিনাশ করিতে চাও? গোস্বামি! তুমি ধন্য! কেন না, তোমার দেহ প্রভুর কাজে লাগিবে। কিন্তু আমার কি দুর্ভাগ্য যে, আমি তাঁহার নিজের কোনও কাজে আসিলাম না। এই পুণ্যভূমি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া, এ জীবন ব্যর্থ গেল।”

“তোমার দেহ কহে প্রভু ‘মোর নিজ ধন,’
তোমা সম ভাগ্যবান্ নহে কোন জন।
আমার এই দেহ প্রভুর নিজ কার্য্যে না লাগিল,
ভারতভূমিতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ গেল।”

(শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীসনাতন কহিলেন—

"হরিদাস! তুমি কি বলিতেছ? তোমার দেহ প্রভুর কার্য্যে লাগিল না? প্রভুর গণের মধ্যে তোমার মতন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি ত আমি দ্বিতীয় দেখিতেছি না। কলির জীবে হরিনাম বিতরণের নিমিত্তই প্রভুর ধরাধামে আগমন। তাঁহার সেই নিজ কার্য্য, প্রভু তোমার দ্বারা সম্পন্ন করিতেছেন। তুমি প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম লও এবং সকলকে শুনাও। কেহ বা আচার করে, কিন্তু প্রচার করে না, অপর কেহ বা প্রচার করে, কিন্তু আচার করে না। তুমি উভয় কার্য্যই কর। অতএব তোমার সমান কে? তুমি সকলের গুরু, তুমি জগতের আর্য্য!"

"আপনি আচরে কেহ না করে প্রচার,
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার।
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য,
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য!"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"

অর্থ। ত্বদীয় বাক্যামৃত প্রতপ্ত জনের জীবনস্বরূপ,

ব্রহ্মবিদ্‌গণের সংস্তুত ও পাপহর। উহা শ্রবণমাত্র কল্যাণ ও শান্তি লাভ হয়। ধরাতলে যাঁহারা বিস্তারিতরূপে তাহা পান করান, তাঁহারাই ভূরিদাতা ও ধন্য।

ঠাকুর হরিদাসের কথা শেষ হইয়া আসিল। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনাই অজ্ঞাত। নীলাচলে আসিয়া তিনি পনর ষোল বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি আপন আশ্রমে থাকিয়া অহর্নিশি সাধন-ভজনেই রত থাকিতেন। তবে মহাপ্রভুর অনুরোধে কখন কোথাও যাইতেন, এইমাত্র। আমরা পূর্ব্বেই এক স্থলে বলিয়াছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় প্রবেশ করিয়া তিনি আপনাকে সেই লীলা-তরঙ্গে একবারে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। এই কারণেও তাঁহার জীবনে ঘটনা-বাহুল্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তিনি যে দিবারাত্রিতে তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন, এই একটি ঘটনাই লক্ষ ঘটনার তুল্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। আচার দ্বারা যে প্রচার, তাহাই শ্রেষ্ঠ প্রচার। হরিদাস ঠাকুর ৭৫ বৎসর কাল ধরাধামে ছিলেন। তাঁহার এই সুদীর্ঘ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম তাঁহার রসনায় উচ্চারিত হইয়া গগনে-পবনে যে কি শক্তি, কি মঙ্গল-প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কত কোটী অর্ব্বুদ ভূচর খেচর প্রাণী সেই শ্রবণ-মঙ্গল হরিনামের শক্তিতে মুক্তির পথ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? সেই বেণা-পোলের জঙ্গলে হরিদাস ঠাকুরের দেবকণ্ঠ হইতে যে জগন্মঙ্গল হরিনামের ধ্বনি উত্থিত হইয়া মহোদধির কূলে আসিয়া

শ্রীশ্রীজগন্নাথের পাদপদ্মে বিলীন হইয়াছিল, সেই ধ্বনি, সেই সঙ্গীত, সেই সুর, সেই স্বর, অদ্যাবধি মরুৎ-ব্যোমে ধ্বনিত রহিয়াছে। যাঁহার শুনিবার কান আছে, তিনি শুনেন—ঠাকুর হরিদাস গাইতেছেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

মহাপ্রস্থান

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মহাপ্রভুর সেবক ভাগ্যবান গোবিন্দ প্রতিদিন ঠাকুর হরিদাসের আশ্রমে তাঁহার জন্য মহাপ্রসাদ লইয়া আসিতেন। হরিদাস ঠাকুর দিবারাত্রি বসিয়া বসিয়াই হরিনাম করিতেন, কখনও শয়ন করিতেন না। কিন্তু এক দিবস গোবিন্দ মহাপ্রসাদ দিতে আসিয়া দেখেন যে, ঠাকুর শয়ন করিয়া আছেন এবং ক্ষীণকণ্ঠে সংখ্যানাম কীর্ত্তন করিতেছেন। গোবিন্দ বলিলেন, "ঠাকুর! আজ যে শয়ন করিয়া? উঠিয়া প্রসাদ গ্রহণ করুন।"

ঠাকুর হরিদাস বলিলেন—"অদ্য আমার এখন পর্য্যন্ত নিয়মিত সংখ্যাকীর্ত্তন সমাপ্ত হয় নাই। তাই ভাবিয়াছি, আজ লঙ্ঘন দিব। কিন্তু মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, তাহাইবা কেমন

করিয়া উপেক্ষা করি ?" এই বলিয়া এক কণিকা মহাপ্রসাদ লইয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিলেন।

গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকট যাইয়া হরিদাস ঠাকুরের অবস্থা জানাইলেন। মহাপ্রভু পরদিন নিয়মিত সময়ে হরিদাসের আশ্রমে আসিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিদাস মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"শরীর অসুস্থ নহে মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন।"

মহাপ্রভু বলিলেন—"হরিদাস! তোমার কি ব্যাধি, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল।"

হরিদাস উত্তর করিলেন—"আর কিছু নয় প্রভো! আমি সংখ্যা-জপ পূর্ণ করিতে পারিতেছি না।"

মহাপ্রভু বলিলেন—"হরিদাস! এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, এখন হইতে নাম-সংখ্যা অল্প কর। তুমি সিদ্ধ পুরুষ, তোমার আবার সাধনের জন্য এত আগ্রহ কেন? আমি জানি যে, কেবল লোক-নিস্তারের নিমিত্তই তোমার জন্ম। তাহা ত যথেষ্ট করিয়াছ। তুমি এ জগতে নামের মহিমা অল্প প্রচার কর নাই।"

তখন হরিদাস ঠাকুর আবেগপূর্ণ হৃদয়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! আমার মনে লইতেছে যে, তুমি অচির-কাল মধ্যেই লীলা সাঙ্গ করিবে। প্রভো! তোমার দোহাই, যেন সে লীলা আমার চক্ষে দেখিতে না হয়। তোমার নিকট আমার এই কাতর প্রার্থনা যে, যেন তোমার সম্মুখে এই দেহ বিসর্জ্জন দিতে পারি। বড় সাধ প্রভো! এ প্রাণ যাইবার

কালে তোমার চরণকমল হৃদয়ে ধারণ করিব, নয়নে তোমার ও চাঁদ-বদন দর্শন করিব এবং রসনায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে চলিয়া যাইব। কৃপা করিয়া আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার মনের সাধ পূর্ণ হয়।"

"হৃদয়ে ধরিব তোমার কমলচরণ,
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন।
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম,
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ।"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

মহাপ্রভু কহিলেন—"হরিদাস! তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, কৃষ্ণ তাহাই অবশ্য পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, ইহা তোমার উচিত নহে। আমার যাহা কিছু সুখ তোমাকে লইয়া।

"কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা,
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া।"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া কাকুতি করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আমাকে ছলনা করিও না। আমার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেই হইবে। তোমার লীলার সহায় কত কত মহাশয় আছেন—আমি যাঁহাদিগকে আমার মাথার মণি জ্ঞান করি, এমন কত শত শত ভক্ত রহিয়াছেন। আমি কীট।

আমি মরিলে পৃথিবীর কিছুই হানি নাই। একটী ক্ষুদ্র পিপী-
লাকা মরিলে তাহাতে জগতের কি আসিয়া যায়? ঠাকুর!
আমার এই বাসনা অপূর্ণ রাখিও না।"

"আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল,
এক পিপীলাকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

মহাপ্রভু আর কোনও উত্তর না করিয়া গম্ভীর হইয়া চলিয়া
গেলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, পরদিন প্রাতে পুনরায়
আসিবেন। ঠাকুর হরিদাস পরদিনের প্রতীক্ষায় সারাদিন
সারারাত্রি ব্যাকুলপ্রাণে নাম কীর্ত্তনে কাটাইলেন। ১৪৪৭ শক,
ভাদ্র মাস। অদ্য শুক্লা-অনন্ত-চতুর্দ্দশী। অদ্য প্রভাতে মহাপ্রভু
জগবন্ধু দর্শন করিয়া হরিদাসের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত
হইলেন। প্রতিদিন আসেন দুই একটি মাত্র ভক্ত সঙ্গে লইয়া,
আজ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া আসিয়াছেন। ঠাকুর হরিদাস আঙ্গিনায়
আসিয়া আগে মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন, পরে ভক্তবৃন্দকে
প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু হরিদাসের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে
হরিদাস এই মাত্র বলিলেন—"প্রভো! যেমন তোমার কৃপা।"

হরিদাস ঠাকুরের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু
তখন ভক্তবৃন্দকে সংকীর্ত্তন করিতে অনুমতি দিলেন। স্বরূপ
গোসাঞি প্রভৃতি ভক্তগণ মিলিয়া হরিদাসের আঙ্গিনায় মহা-
সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহারা ঠাকুর হরিদাসকে

প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই কীর্ত্তনে বক্রেশ্বর পণ্ডিত খুব নাচিলেন। ঠাকুর হরিদাসের উঠিবার শক্তি ছিল না। তিনি বসিয়া বসিয়া অশ্রু, কম্প, পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবে আকুল হইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন থামিল। সকলে ঠাকুরকে ঘেরিয়া বসিলেন। রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবের নিকট মহাপ্রভু অধীর হইয়া হরিদাসের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

সকল ভক্ত ঠাকুর হরিদাসকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস তাহা দেখিতে পাইলেন না। কারণ তিনি এক মনে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের রূপমাধুরীই নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। মহাপ্রভু একটু ব্যবধানে বসিয়াছিলেন; হরিদাস সে ব্যবধান সহিতে পারিতেছিলেন না। তিনি মহাপ্রভুকে নিজের সম্মুখে আনিয়া বসাইলেন এবং তাঁহার চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর হরিদাসের বদন প্রফুল্ল, থাকিয়া থাকিয়া সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতেছে, অশ্রুবিগলিত নয়নে শ্রীগৌরাঙ্গের বদন পানে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন; মুখে অন্য কোনও কথা নাই, কেবল 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' উচ্চারণ করিতেছেন; তাহাতেই যেন মরমের কত কথা ব্যক্ত হইতেছে। মহাপ্রভু বুঝিলেন, মহাপ্রস্থানের আর বিলম্ব নাই।

"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভু বসাইল,
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল।

স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ,
সর্ব্বভক্ত পদরেণু মস্তকে ভূষণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বলে বার বার,
প্রভুমুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করি উচ্চারণ,
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

হরিবোল! হরিবোল! এমন স্বেচ্ছামৃত্যু, মহাযোগীর ন্যায় এমন স্বচ্ছন্দ মরণ কেহ কখনও দেখে নাই। যেন ভীষ্মের নির্যাণ! ঠাকুর হরিদাসের এহেন সুখের মরণ দেখিয়া ভক্তবৃন্দ মুহুর্মুহূঃ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সকলে মিলিয়া তারস্বরে হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে শত শত লোক আসিয়া সেই কীর্ত্তনে যোগ দিল। দেখিতে দেখিতে ঠাকুর হরিদাসের আঙ্গিনা লোকে লোকারণ্য হইল। সংকীর্ত্তন-কোলাহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহাপ্রভু শ্রীশচী-নন্দন প্রেমে বিহ্বল হইয়া ঠাকুর হরিদাসের দেহ বক্ষে তুলিয়া লইলেন এবং উহা স্কন্ধে স্থাপন করিয়া মহাভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া,
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

মরি! মরি! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ভক্ত-দেহ স্কন্ধে করিয়া

প্রভু নৃত্য করিতেছেন! এ দৃশ্য দেখিতে বুঝিবা তৎকালে স্বর্গের দেবতারাও সেখানে আসিয়াছিলেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া, ভক্তবাৎসল্যের সেই অপূর্ব্ব চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়া, ভক্তবৃন্দ ও সমবেত জনসঙ্ঘ মহাপ্রভুর নামে ও ঠাকুর হরিদাসের নামে মহা জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং নাচিয়া গাহিয়া ও অঙ্গে ঠাকুর হরিদাসের আঙ্গিনার ধূলা মাখিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। জয় শচীনন্দন! জয় শচীনন্দন! জয় হরিদাস! জয় হরিদাস!

ভক্তবৃন্দ হরিদাস ঠাকুরের দেহ বিমানে (চতুর্দ্দোলায়) চড়াইয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে * 'স্বর্গদ্বারে' লইয়া গেলেন। সে স্থানে দাঁড়াইয়া কিছুকাল কীর্ত্তন হইল। পরে সমুদ্রের জল তুলিয়া ঠাকুর হরিদাসকে স্নান করান হইল। ভক্তগণ ঠেলাঠেলি করিয়া হরিদাসের পাদোদক পান করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"হরিদাসের স্নান-জলে সমুদ্র আজ মহাতীর্থ হইল।"

"হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইল,
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল।
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ,
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

---

* 'স্বর্গদ্বার' শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের সমুদ্রতীরের অংশবিশেষের নাম। স্বর্গদ্বারে ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে। সে স্থানে প্রতিদিন ঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে এবং অনন্ত চতুর্দ্দশীতে উৎসব হয়।